THE DELTA PERSPECTIVES: MANY VOICES

SIBANI MANDAL MAHAVIDYALAYA

শিবানী মন্ডল মহাবিদ্যালয়

2025

Volume: 1. Number: 1

THE DELTA PERSPECTIVES: MANY VOICES
The Bilingual Half-yearly Magazine published by
SIBANI MANDAL MAHAVIDYALAYA
P.O.: Namkhana, P.S. & Block: Namkhana
District: South 24 Parganas
Pin: 743357 (West Bengal)
Website:
Email address: principalsmm2023@gmail.com, sibani.mandal13@gmail.com

Volume: 1, Number: 1

শিবানী মণ্ডল মহাবিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত ষাণ্মাসিক দ্বিভাষিক পত্রিকা

প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

23rd July, 2025

© Sibani Mandal Mahavidyalaya

Chief Editor

Dr. Atish Dipankar Jana

Principal
Sibani Mandal Mahavidyalaya

Editorial Board

Joint Editors

Dr. Soumik Banerjee and Ms. Ananya Das

Respected Members

Dr. Dayal Chand Sardar
Dr. Kavita Sarkar
Mr. Rabinraj Tamang
Mrs. Sumana Tripathi Pahari
Mr. Balaram Mondal
Mr. Pulak Ranjan Das
Mrs. Ria Chatterjee
Mr. Subhajit Mondal

Foreword

It gives me immense pleasure to present the inaugural volume of *The Delta Perspectives: Many Voices*, the bilingual half-yearly magazine of Sibani Mandal Mahavidyalaya. This magazine is a collective expression of our students and teachers, anchored in the unique geography, history, culture, biodiversity and lived realities of the Namkhana delta, including Mousuni and the surrounding islands. The first issue captures the heart of our delta through diverse write-ups—folk narratives from Mousuni, insights into Sagarmela and Ghoramara, accounts of the economic conditions of Mousuni Island, and reflections on the devastating impact of Yash on Ghoramara. It also documents the medicinal richness of Sundarban flora, fish diseases affecting the local aquatic ecosystem, and the history of the ancient Shiva Temple of Patharpratima. Essays celebrating Banabibi, the forest goddess, and the traditional Manasa Puja of Namkhana remind us of the deep spiritual roots that bind our communities. Alongside these scholarly and cultural explorations, creative contributions from students add vibrancy to this volume: touching poetry on memory, motherhood, society, environmental suffering, tradition, patriotism and the agony of conflict; real-life travel stories such as the visit to Jorasanko; engaging short stories like "Ideal Bus Conductor", "A Handful of Dream", "Banalata", and "Laraku Baba"; thoughtful free prose reflecting on village-city conversations, seasons, aspirations, gender issues, unemployment and the mysteries of love; and informative essays on science and technology, women's education, the essence of cultural celebration, and the human cost of war. Through these many voices and perspectives, this magazine becomes a platform for encouraging curiosity, creativity and academic engagement rooted in our local heritage. I congratulate all contributors, editors and mentors who have worked with great enthusiasm to bring this first volume to life. I hope that *The Delta Perspectives* will continue to inspire, inform and deepen our connection with the delta that sustains us. I warmly welcome readers to join us on this journey of knowledge, culture and collective identity.

Dr. Atish Dipankar Jana
Principal
Sibani Mandal Mahavidyalaya, Namkhana
(First Volume — First Year)

প্রস্তাবনা

শিবানী মণ্ডল মহাবিদ্যালয়ের দ্বিভাষিক অর্ধবার্ষিক পত্রিকা *দ্য ডেল্টা পার্সপেক্টিভস: মেনি ভয়েসেস*-এর প্রথম বর্ষের প্রথম খণ্ড পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমাদের ছাত্র–শিক্ষকদের সৃষ্টিশীল এবং প্রজ্ঞামূলক লেখনী এই পত্রিকার প্রাণশক্তি, যা নামখানা ডেল্টা — বিশেষত মৌসুনি ও সংলগ্ন দ্বীপাঞ্চলের ইতিহাস, সংস্কৃতি, সমাজজীবন, জীববৈচিত্র্য ও পরিবর্তনশীল জীবনের বহুরৈখিক ছবি তুলে ধরেছে। এই প্রথম সংখ্যায় মৌসুনির লোকগাথা, সাগরমেলা ও ঘোরামারা দ্বীপের বিবরণ, মৌসুনির আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ঘূর্ণিঝড় "যশ"-এর প্রভাব, সুন্দরবনের ঔষধি উদ্ভিদের ব্যবহার, স্থানীয় মাছের রোগসমূহ, পাথরপ্রতিমার প্রাচীনতম শিবমন্দিরের ইতিহাসসহ আমাদের অধ্যুষিত ভূমির পরিবেশ ও ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে গুরুত্বপূর্ণ রচনাসমূহ স্থান পেয়েছে। স্থানীয় আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের ধারাকে স্মরণ করিয়ে দেয় বনদেবী বনবিবির উপাখ্যান এবং নামখানা অঞ্চলের মানসা পূজার বিশদ বিবরণ।

এছাড়াও, ছাত্রছাত্রীদের সৃজনশীল কলমে ফুটে উঠেছে নানা অনুভব— স্মৃতি, মা, সমাজ, প্রকৃতির নির্যাতন, ঐতিহ্য, স্বাধীন দেশের গৌরব, রক্তাক্ত কাশ্মীর প্রভৃতি বিষয়ের ওপর হৃদয়স্পর্শী কবিতা; জোড়াসাঁকো ভ্রমণের বাস্তব অভিজ্ঞতা; "আদর্শ বাস কন্ডাক্টর", "এক মুঠো স্বপ্ন", "বনলতা", "লড়াকু বাবা" প্রভৃতি আকর্ষণীয় গল্প; গ্রাম–শহরের দ্বন্দ্ব, বর্ষার দিন, দিবাস্বপ্ন, নারীর অবস্থান, বেকারত্বের সমস্যা, রহস্যময় প্রেম ইত্যাদি বিষয়ভিত্তিক মুক্ত গদ্য; এবং বিজ্ঞান–প্রযুক্তির ব্যবহার, নারীশিক্ষা, সাংস্কৃতিক দিবস উদযাপনের অভিজ্ঞতা, ভোগবাদী পৃথিবীতে সুখের সন্ধান, ভারত–পাকিস্তান যুদ্ধ, যুদ্ধের নৃশংসতা প্রভৃতি বাস্তবমুখী প্রবন্ধ এই সংখ্যাকে করেছে বহুমাত্রিক।

বহু কণ্ঠের বহুস্বরী ভাবনার মিলনে এই পত্রিকাটি আমাদের ছাত্রছাত্রীদের কৌতূহল, সৃজনশীলতা ও স্থানীয় ঐতিহ্যের প্রতি গর্বকে নতুন দিগন্তে পৌঁছে দেবে— এই আমার আন্তরিক বিশ্বাস। এ সংখ্যার সমস্ত রচয়িতা, সম্পাদকমণ্ডলী ও সহকারীদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। *দ্য ডেল্টা পার্সপেক্টিভস* ভবিষ্যতেও একইভাবে আমাদের ডেল্টার জীবনের গল্প, সংগ্রাম ও সৌন্দর্যকে নতুন ভাবে তুলে ধরবে— এই আশা ব্যক্ত করছি। পাঠকদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে, আমি এই সংখ্যার শুভ উদ্বোধন করছি।

ড. অতীশ দীপঙ্কর জানা
অধ্যক্ষ
শিবানী মণ্ডল মহাবিদ্যালয়, নামখানা
(প্রথম বর্ষ — প্রথম খণ্ড)

CONTENTS / সূচি

প্রবন্ধ: স্থানীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি, পরিবেশ ও স্বাস্থ্য

মৌশুনি দ্বীপের লোকসংস্কৃতি / রাহুল জানা (৮)
সাগরমেলা ও ঘোড়ামারা দ্বীপ / সুরঞ্জনা ঘোড়ই (১৩)
মৌশুনি দ্বীপের অর্থনৈতিক অবস্থা / শুকদেব বারিক (১৪)
ইয়াস: প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও ঘোড়ামারা / সুস্মিতা ভুঁইয়া (১৭)
সুন্দরবনের ঔষধি উদ্ভিদের বৈচিত্র্য, ব্যবহার / বর্ষা আইচ (২০)
সুন্দরবনের মাছের বিভিন্ন রোগ ও চিকিৎসা / শুভজিৎ মণ্ডল (২৩)
পাথরপ্রতিমার প্রাচীনতম শিবমন্দির / পুলক রঞ্জন দাস (২৭)
বনবিবি / সোমা বেরা (২৯)
নামখানা গ্রামে মনসা পূজা: এক ঐতিহ্যবাহী লোকসংস্কৃতি ও সম্মিলিত সামাজিক উৎসব / প্রসেনজিৎ মণ্ডল (৩০)

কবিতাগুচ্ছ ১

বিশ্বাসের আলো বুনে / রবিনরাজ তামাং (৩২)
স্মৃতি / বিউটি খাঁড়া (৩৫)
প্রকৃতির বেদনা / পম্পা দাস (৩৬)
সমাজ / পিয়ালী বেরা (৩৭)
মা / সাথী শাসমল (৩৮)

ভ্রমণকাহিনি

অতি অল্পই উপভোগ / বিনিতা বারিক (৩৯)
জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা / সুরঞ্জনা ঘোড়ই (৪১)

গল্পসম্ভার

আদর্শ কণ্ডাক্টর / শ্রেয়া জানা (৪২)
বনলতা / পিয়ালী করণ (৪৩)
লড়াকু বাবা / স্নিগ্ধা মাইতি (৪৫)
এক মুঠো স্বপ্ন / অনিন্দিতা দাস (৪৭)

মুক্ত গদ্য

কথোপকথন: গ্রাম ও শহরের কথা / অনিন্দিতা দাস (৪৮)
বর্ষাকাল / লিপিকা সরদার (৫০)
ভালোলাগা-ভালোবাসা / পবন কর (৫১)
দিবাস্বপ্ন / রিমা দাস (৫২)
নারীর সৌন্দর্য / সৌমিত্র জানা (৫৩)
এডুকেশন কেন পড়ব / শম্পা দাস (৫৪)
মায়াবী প্রেম / সঙ্গীতা সিংহ (৫৫)
নারী কি সমাজের বোঝা? / শিল্পা ঘোড়ই (৫৬)
বেকার সমস্যা / সুদীপ্তা মণ্ডল (৫৭)

প্রবন্ধ: বিবিধ প্রসঙ্গ

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার / শিপ্রা দাস (৫৮)
নারী শিক্ষা / অমিতা মাঝি (৫৯)
সংস্কৃত-দিবস পালনের অভিজ্ঞতা / সাথী সেনাপতি (৬০)
In search of pleasure in the Material World/ Dr. Kavita Sarkar (৬১)

কবিতাগুচ্ছ ২

বেঁচে থাক তপোবন / রিয়া চ্যাটার্জি (৬৩)
রক্তাক্ত কাশ্মীর / সুপ্রিয়া মাঝি (৬৪)
ঐতিহ্য / উমা হালদার (৬৫)
স্বাধীন দেশ / কাবেরী বেরা (৬৬)
তারা / প্রসেনজিৎ গিরি (৬৭)

সাম্প্রতিক আলোচনা: বিষয় 'যুদ্ধ'

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বিষয়ক একটি প্রবন্ধ / অনন্যা কর্মকার (৬৮)
যুদ্ধ: একটি অপরাধ / শেখ সাহিদ (৭০)

মৌশুনি দ্বীপের লোকসংস্কৃতি

Rahul Jana, Department of History, Semester - VI, Sibani Mandal Mahavidyalaya

মৌশুনি দ্বীপ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নামখানা ব্লকে অবস্থিত একটি অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যপূর্ণ স্থান। কথিত আছে জঙ্গলাকীর্ণ মৌশুনি দ্বীপে একসময় প্রচুর মধু পাওয়া যেত এবং প্রায়শই মৌমাছির গুঞ্জন শুনতে পাওয়া যেত তাই এই দ্বীপের নামকরণ করা হয় মৌশুনি। আবার অনেকে বলেন মৌসুমী বায়ু এই দ্বীপে প্রথম প্রবেশ করে বলে এই দ্বীপের নামকরণ করা হয় মৌশুনি দ্বীপ। বঙ্গোপসাগরের কোলে অবস্থিত এই দ্বীপটি সুন্দরবনের একটি অংশ। তবে এই দ্বীপটি কবে সৃষ্টি হয়েছিল বা কবে থেকে এর উৎপত্তি ঘটে, তার কোন সুনির্দিষ্ট তারিখ বা সালের কোন ঐতিহাসিক রেকর্ড নেই। কারণ এটি একটি প্রাকৃতিক ব-দ্বীপ, যা গঠিত হয়েছে গঙ্গা ও বঙ্গোপসাগরের স্রোত ও পলি জমার ফলে। তবে অনুমান করা হয় আজ থেকে প্রায় ১০০ বছর আগে এই দ্বীপের উৎপত্তি ঘটে। ১৯৩০ সালে ১২ ই মার্চ মহাত্মা গান্ধী ডান্ডি পদযাত্রা বা লবণ সত্যাগ্রহ শুরু করলে, সেই আন্দোলনের ঢেউ বাংলা এসে পৌঁছায়। মেদিনীপুরের বহু নরনারী এই আন্দোলনের অংশগ্রহণ করে। এই আন্দোলনে গ্রাম অঞ্চলের নারীদের অংশগ্রহণ ছিল প্রশ্নাতীত। এই সময় মেদিনীপুরের গ্রামাঞ্চলে পুলিশের দমন পিড়ন চূড়ান্ত আকার নেয়। ক্রমশ সমগ্র মেদিনীপুরের সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে এই আন্দোলন প্রভাব বিস্তার লাভ করে। সম্ভবত এই আন্দোলনের পরেই মেদিনীপুরের সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল থেকে বহু মানুষ এসে বন কেটে স্থায়ী বসতি নির্মাণ করেন। প্রথম দিকে যারা বন কেটে জমিকে চাষযোগ্য ও বাসযোগ্য করেছে তাদের সর্বাধিক ১৫ বিঘা করে জমি পাট্টা দেওয়া হয়েছিল। তবে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত এই দ্বীপ শুধু প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ নয়, এখানকার লোকসংস্কৃতি নিজস্ব মৌলিকতা ও ঐতিহ্যের বিচারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও মৌশুনি দ্বীপ জনবসতীর দিক থেকে অপেক্ষাকৃত ছোট এবং কিছুটা বিচ্ছিন্ন। যার পূর্ব দিকে রয়েছে চিনাই নদী। যা নামখানা ও মৌশুনি মাঝ দিয়ে গিয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। এবং এই দ্বীপের পশ্চিম দিক দিয়ে সাগর ও মৌশুনি দ্বীপের মাঝখান দিয়ে মুড়িগঙ্গা নদী বয়ে গিয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। এই দ্বীপ পুরোটাই জলদ্বারা বেষ্টিত। তবুও এখানকার লোকসংস্কৃতি জীবনের প্রতিটি স্তরে এক গভীর প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে।

লোকসংস্কৃতির ধারণা:-

লোকসংস্কৃতি বলতে বোঝানো হয় একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেই সকল বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, গান, নৃত্য, পোশাক, খাদ্যাভ্যাস, লোককথা এবং অন্যান্য সৃজনশীল কর্মকাণ্ডকে, যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসছে। মৌশুনি দ্বীপের লোকসংস্কৃতিও এর ব্যতিক্রম নয়। এখানকার মানুষের জীবনযাত্রা, প্রাকৃতিক পরিবেশ, পেশা ও পারিপার্শ্বিকতা মিলিয়ে যে সংস্কৃতির জন্ম হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে গবেষণার বিষয়।

ধর্ম ও লোকবিশ্বাস:-

মৌশুনি দ্বীপের মানুষের ধর্মীয়চর্চা মূলত হিন্দুধর্ম কেন্দ্রীয় হলেও কিছু সংখ্যক মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ এখানে বসবাস করে। এই তিন ধর্ম ও বর্ণের মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান আছে মৌশুনিতে। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের উৎসব ও সংস্কৃতি ভিন্ন ভিন্ন হয়। তবে এই ভিন্নতার মধ্যেও নিবিড় ঐক্য আছে। হিন্দুদের উৎসব ও সংস্কৃতিতে মুসলমান ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ অংশগ্রহণ করে এবং আনন্দ উপভোগ করে, আবার মুসলমান

ও আদিবাসীদের যেকোনো উৎসবে হিন্দুরাও অংশগ্রহণ করে ও আনন্দ উপভোগ করে। এখানকার আদিবাসীদের মধ্যে ধর্মগত বর্ণগত অথবা জাতিগত গোঁড়ামি, উগ্রতা বা অসহনশীলতা একেবারে নেই বললেই চলে। পাশাপাশি বসবাসকারী ভিন্ন ধর্ম ও বর্ণের মানুষ সুনিবিড় ভাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। এই দ্বীপের গ্রামীণ সমাজে লোকবিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। গ্রাম দেবতার পূজা, বনবিবির পূজা, শীতলা পূজা, মনসা পূজার মতো আঞ্চলিক ধর্মীয় উৎসব এখানে আজও সমানভাবে পালন করা হয়। সুন্দরবনের বনবিবির পূজা অত্যন্ত জনপ্রিয়। বনবিবি সুন্দরবনের রক্ষাকর্ত্রী দেবী হিসেবে পূজিত হন। কথিত আছে যে, এই মৌশুনি দ্বীপ যখন পুরোটা অরন্যবৃত ছিল, সেই সময়ের মধু সংগ্রাহক, জেলে, কাঠুরে ও বনজীবীরা বাঘ ও বনের অন্যান্য পশুদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য বনবিবিকে পূজা করে জঙ্গলে প্রবেশ করতো মধু সংগ্রহ করতে। তবে এই দ্বীপে যে একসময় বাঘের উপদ্রব ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় এখানকার একটি গ্রাম যার নামকরণ করা হয় বাগডাঙ্গা। বলাহয় একসময় মৌশুনি দ্বীপের নদী এতটাই ছোট ছিল যে বাঘ সহজেই ডিঙিয়ে যেতে পারতো, তাই এই গ্রামের নামকরণ করা হয় বাগডাঙ্গা। এছাড়া এই দ্বীপে বর্ষাকালে জলবাহিত রোগ প্রতিরোধ ও সন্তান রক্ষার প্রার্থনায় শীতলা, মনসা ও গঙ্গা পূজা এক বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। বছরের সুনির্দিষ্ট সময়ে এই পূজাকে কেন্দ্র করে বার্ষিক মহোৎসব হয়। স্থানীয় নারী পুরুষ সংসারের মঙ্গল কামনায় গ্রাম-দেবতার কাছে ব্রত রাখে, ভোগ নিবেদন করে এবং নানান অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করে। বালিয়াড়ার সল্টঘেরীতে ডিসেম্বর মাসে বিশালক্ষী, শীতলা, মনসা ও গঙ্গা মায়ের পূজা উপলক্ষে বড় মেলা হয়। সাত দিনের মেলার, প্রতিদিন রাতে যাত্রা, গাজন, লোকগান ইত্যাদি অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকে। বালিয়াড়ার জেলে মাঝিদের এটাই প্রধান উৎসব। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ যারা সমুদ্রে মাছ ধরার কাজে যুক্ত থাকে, তারা এই উৎসবে অংশগ্রহণ করে। গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গেলে নানান বিপদের সম্মুখীন হয়। আর এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য দেবতার শরণাপন্ন হওয়ার পথ বেছে নেয়। এই সমস্ত ধর্মীয় আচরণ শুধু বিশ্বাস নয়, বরং গ্রামের সামাজিক সংহতির প্রতীকও বটে। ধর্মীয় এই আচার গুলিতে সংগীত, নাটক এবং লোকগাঁথার সম্মেলন ঘটে, যা লোকসংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে।

লোকসংস্কৃতির অন্যতম ধারক হল মৌশুনি দ্বীপের বাগডাঙ্গার পূর্ব দিকে অবস্থিত পাঁচু মন্দির। যা দ্বীপের মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস, সংস্কার এবং লোকসংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক। এই মন্দির বা স্থানটির সঙ্গে জড়িত আছে বহু বছর ধরে চলে আসা বিশ্বাস, পূজা পদ্ধতি ও লোক কাহিনী, যা মৌশুনির নিজস্ব সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। প্রতিবছর চৈত্র বা বৈশাখ মাসে পাঁচুবাবার বা পাঁচু মন্দিরে বার্ষিক মেলা ও পূজা হয়। তবে প্রতি শনি ও মঙ্গলবার ভক্তের ভিড় হয়। মৌশুনি দ্বীপের বাইরে থেকেও বহু লোকজন এখানে আসে। বহু মানুষ এখানে মানত করে - সন্তান কামনা, রোগ মুক্তি, পরীক্ষায় সফলতা বা বিপদ থেকে রক্ষার জন্য। মানত পূরণ হলে মহা ধুমধামে পাঁচু গোপাল ঠাকুরের মাটির মূর্তি ও প্লাস্টিকের পুতুল দিয়ে পুজো দিয়ে যায়। ভক্তদের দান করা হাজার হাজার পাঁচু গোপাল ঠাকুরের মূর্তি ও প্লাস্টিকের পুতুল আজও মন্দিরের চারিপাশে জড় হয়ে আছে। স্থানীয় প্রবীনদের মুখে শোনা যায় কোনও এক সময় পাঁচুবাবা এক মহৎতান্ত্রিক বা সাধক ছিলেন, যিনি এই দ্বীপের মানুষকে ঝড় জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষা করতো। কেউ বলেন, তিনি ছিলেন একজন যোগী। যিনি পরলোকগত হয়ে লোকোদেবতার মর্যাদা পান। এখানকার সেবাইতরা ভক্তদের সমস্যা সমাধানে একপ্রকার ভেষজ ঔষধ ও রুপা ও তামার তৈরি মাদুলি দিয়ে থাকে। অসংখ্য মানুষের অগাধ বিশ্বাস মৌশুনির পাঁচু গোপাল মন্দির কে বিখ্যাত করেছে। মৌশুনি দ্বীপের এই পাঁচু মন্দির কেবল একটি পূজার স্থান নয় - এটি লোকবিশ্বাস, সংস্কৃতি, জীবনদর্শন ও মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কের এক জীবন্ত নিদর্শন। এখানে ধর্ম সংস্কৃতি ঐতিহ্য একত্রে মিশে এক অনন্য সংস্কৃতির সৃষ্টি করেছে, যা মৌশুনিকে আলাদা পরিচয় দেয়।

মৌশুনি দ্বীপে বসবাসকারী হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যে মূলত মৎস্যজীবী ও কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের আধিক্য থাকলেও কিছু আদিবাসী পরিবার মৌশুনির বালিয়াড়া ও ১লা ঘেরীর নদী ঘেঁষা এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে আসছে। এদের সংস্কৃতির পরিচিতি ভিন্ন রকম এবং তাদের নিজস্ব কিছু লোকানুষ্ঠান ও আচার-অনুষ্ঠান রয়েছে। যেগুলি দ্বীপের সামগ্রিক লোকসংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই আদিবাসীরা বছরে তিনবার খুব ধুমধাম করে উৎসব পালন করে। তারা জাহের ইস্কন, মারাং বুরু ইত্যাদি আদিবাসী দেবতার পূজা করে থাকেন। জৈষ্ঠ মাসের যেকোনো একটি রবিবার সাঁওতালরা খুব ধুমধাম করে মারংবুরুর পূজা করে। বালিয়াড়া ও পয়লাঘেরিতে এই উৎসব হয়। বালিয়াড়ার সাঁওতালপাড়ায় সাঁওতালদের পুরোহিত একটি গামা গাছকে চিহ্নিত করে। এই উৎসবকে সাঁওতালরা সুরাসাগেন বলে। এই সুরাসাগেন পর্বকে কেন্দ্র করে বালিয়াড়াতে ২-৩ দিনের একটি মেলা বসে। এই মেলায় আদিবাসীরা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির উপস্থাপন করে। করম উৎসব এখানে সীমিত পরিসরে পালিত হয়। ভ্রাতৃত্ব ও প্রকৃতির আরাধনা এই উৎসবের মূল মন্ত্র। তারা একটি করম গাছের ডাল মাটিতে পুঁতে তার চারপাশে নৃত্য ও গান করে। বিশেষত যুবক-যুবতীরা এতে অংশগ্রহণ করে। আদিবাসী নারীরা সাধারণত দলবদ্ধভাবে হাত ধরাধরি করে নেচে ঝুমুর গান পরিবেশন করে। এতে প্রকৃতির প্রেম, জীবন সংগ্রাম ও পরম্পরার কথা প্রকাশ পায়। উৎসব গুলিতে হাড়িয়া পরিবেশনের রীতি রয়েছে, যা অতিথি আপ্যায়নের অংশ। আদিবাসী এই উৎসব গুলিতে ধর্ম নয়, বরং সমাজ জীবনের আনন্দ ও ঐক্যই মুখ্য। এতে ভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর মানুষও অংশগ্রহণ করে। এইসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মৌশুনি দ্বীপে আদিবাসী সংস্কৃতি ও মূল্যধারার সংস্কৃতির এক মিলনস্থল গড়ে উঠেছে, যা দ্বীপের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির রূপকে আরো সমৃদ্ধ করে তোলে।

উৎসব ও পার্বন:-

পশ্চিমবঙ্গের অন্য এলাকার মতো এখানেও দুর্গাপূজা মহা ধুম ধামে-এর সঙ্গে পালিত হয়। পাড়ায় পাড়ায় স্থানীয় যুবকেরা মিলে চাঁদা তুলে মন্ডপ সাজায় অনুষ্ঠান করে। পাঁচদিন ধরে চলা দুর্গাপুজোয় দ্বীপের সমস্ত ধর্মের মানুষ অংশগ্রহণ করে। এই দ্বীপে তিনটি স্থানে দুর্গোৎসব হয় - ১. বাগডাঙ্গা খাসমোহল মাঠে ২. মৌশুনি পয়লাঘেরিতে ও ৩.বালিয়াড়া মন্ডল বাজারে। দূর্গাপূজার প্রথম দিন ষষ্ঠিতে প্রতিটি বাড়ি রঙিন সাজে সেজে ওঠে, প্রতিটি হিন্দু বাড়িতে আলপনা করা হয়, যা প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। এটি গ্রামীণ ঐতিহ্যর অন্যতম ধারক। এছাড়া কালীপূজা, লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতী পূজা সমান গুরুত্ব পায়। এছাড়া এই দ্বীপের নদী গুলতে পৌষসংক্রান্তি ও মাঘ মাসের পয়লা দিনে বহু মানুষ গ্রাম থেকে এসে নদীতে স্নান করে ও পূজা দেয়, পূর্ণ লাভের আশায়। মৌশুনি দ্বীপের অর্থনীতির অন্যতম ভিত্তি হল কৃষিকাজ। আর এই কৃষি প্রধান জনগোষ্ঠীর অন্যতম ঐতিহ্যবাহী উৎসব হলো নবান্ন। ধান কাটা শেষ হলে নতুন চাল দিয়ে পিঠে,পায়েস তৈরি হয়। এই সময় গ্রামে গান বাজনার অনুষ্ঠান হয়, যা লোকসংস্কৃতির পরিচয় এর ধারক।

মৌশুনি দ্বীপে হিন্দুধর্মালম্বী মানুষ বেশি হওয়ায় এখানে কেবল হিন্দু দেব দেবীর পূজা হয় এমন নয়। এখানে মুসলমান ধর্মের উৎসবও সমানভাবে গুরুত্ব পায়। মুসলমান ধর্মালম্বীরা ঈদ উপলক্ষে বছরের দুইবার নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। মুসলমানদের মহরম উৎসব কে কেন্দ্র করে একটি বড় মেলা বসে। এটি বাগডাঙ্গা খাসমহল মাঠে বছরে একবার অনুষ্ঠিত হয়। এখানে মুসলমান ধর্মালম্বীরা বিভিন্ন ধরনের খেলা দেখায়, যা দেখতে হিন্দু মুসলিম আদিবাসী সকল সম্প্রদায়ের মানুষ ভিড় করে। যা এই দ্বীপের লোকসংস্কৃতিকে আরও সমৃদ্ধ করে।

গ্রামীণ নাট্যশিল্প ও সংগীত:-

মৌশুনি দ্বীপের সংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটি বিশেষ দিক হলো তাদের লোকনাট্য। নাট্যকলার মধ্যে স্থায়ীভাবে প্রচলিত রয়েছে - যাত্রাপালা, কীর্তন প্রভৃতি। মৌশুনির বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যাত্রাপালার আয়োজন করা হয়। যাত্রায় পৌরাণিক কাহিনী, সামাজিক বার্তা, প্রেম এবং দেশপ্রেমের চিত্র ফুটে ওঠে। যাত্রাপালার মাধ্যমে গ্রামের মানুষজন বিনোদন ও শিক্ষার যুগপৎ স্বাদ পায়। এছাড়া কীর্তন দল স্থানীয় জনসমক্ষে পারফর্ম করে, যাতে ধর্মীয় ও সামাজিক শিক্ষার বার্তা থাকে।

মৌশুনির লোকসংস্কৃতিতে সংগীতের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। এখানে প্রচলিত গানগুলি গ্রামীণ জীবন, কৃষি, নদী, মৎস্যজীবন, প্রেম এবং ভগবানের প্রতি ভক্তিতে পরিপূর্ণ। ঢোল, মাদল, খঞ্জনি, করতাল ইত্যাদি লোকবাদ্য এখানে প্রচলিত। বিশেষ করে উৎসব ও পূজার সময় এগুলো ব্যবহার দেখা যায়। এছাড়া উৎসব ও সামাজিক অনুষ্ঠানে স্থানীয় নারীরা দল বেঁধে নৃত্য পরিবেশন করেন, যা সমাজে নারীদের সাংস্কৃতিক ভূমিকা তুলে ধরে।

খাদ্যাভ্যাস ও রন্ধন প্রথা:-

মৌশুনি দ্বীপের খাদ্যসংস্কৃতিও লোকসংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। দ্বীপটি নদী ও সমুদ্র ঘেরা অবস্থান অনুযায়ী এখানকার প্রধান খাদ্য ভাত ও মাছ। স্থানীয় রান্নায় বহু লোকজ বৈচিত্র দেখা যায়। জনপ্রিয় খাবারের মধ্যে রয়েছে - চিংড়ির মালাইকারি, কাঁকড়ার ঝোল, পাঁঠার মাংস ইত্যাদি। এছাড়া উৎসবের সময় নারকেল দিয়ে তৈরি পিঠে, পাটিসাপটা, পায়েস, খিচুড়ি ইত্যাদি পরিবেশন করা হয়। রান্নায় সরষে, নারকেল, পোস্ত ও কাঁচা লঙ্কার ব্যবহার ঐতিহ্যবাহী স্বাদ বজায় রাখে।

পোশাক ও অলংকার:-

লোকসংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল এখানকার সাধারণ মানুষের পোশাক ও সাজ সজ্জা। গ্রামীন ঐতিহ্য মেনেই মৌশুনির মানুষের পোশাকের ধরন সাদামাটা হলেও উৎসবের সময় ঐতিহ্যবাহী সাজ দেখা যায়। নারীরা তাঁতের শাড়ি, সিঁদুর, শাঁখা পলা, কাঁচের চুড়ি ইত্যাদি তাদের সাজের অংশ। পূজার সময় আলতা পরা লাল পাড় সাদা শাড়ি পরা ইত্যাদি রীতি তারা রক্ষা করে। পুরুষেরা সাধারণত বিয়ে বা পূজার সময় পাজামা-পাঞ্জাবি পরেন। এছাড়া দৈনন্দিন জীবনে ধুতি, লুঙ্গি, গেঞ্জি বা শার্ট পরে থাকেন। পোশাকের ধরন ও অলংকারের আকার এখানকার সংস্কৃতির দিক নির্দেশ করে।

উপসংহার:-

পরিবেশ ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন এই মৌশুনি দ্বীপ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ও নদী ভাঙ্গন এই দ্বীপবাসীর জীবনের অঙ্গ। প্রতিবছর বাঁধ ভেঙ্গে জল ঢুকে প্রচুর কৃষি জমি নষ্ট করে, বাড়িঘর নষ্ট হয়ে যায়। স্থানীয় মানুষ বাধ্য হয় তাদের পরিবার নিয়ে ত্রাণ শিবিরে থাকতে। তাই তাদের গান কাহিনী নৃত্যে এই ভয়েও সহিষ্ণুতার ছাপ দেখা যায়। অনেক সময় সৃষ্টিশীল কর্মে মানুষ তাদের দুঃখ - বেদনার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

তবে মৌসুমী দ্বীপের লোকসংস্কৃতি এক অনন্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারক। এখানকার মানুষ তাদের পরিবেশ ও জীবনের সংগ্রামের সঙ্গে মিশিয়ে যে সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে, তা নিছক লোকজ ঐতিহ্য নয় - বরং তা

আমাদের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আধুনিকতার ঢেউ ক্রমে এই সংস্কৃতিকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেললেও স্থানীয় মানুষ ও বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার চেষ্টায় এই ঐতিহ্য এখনো বেঁচে রয়েছে। আমাদের দায়িত্ব এই সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ ও চর্চার মাধ্যমে আগামীতেও জীবন্ত রাখা।

তথ্যসূত্র:

1. নাজিবুল ইসলাম মন্ডল সম্পাদিত "সমকালের জিয়ন কাঠি: সাগরদ্বীপের কথা", ড. দয়াল চাঁদ সরদার, 'জীবন ও জীবিকায় মৌশুনী', জানুয়ারি - জুন ২০১৯।
2. ড. দীনেশ চন্দ্র সরকার, "সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ", সাহিত্য লোক, ১৩৮৯।
3. ড. নীহার রঞ্জন রায়, "বাঙ্গালীর ইতিহাস", আদি পর্ব, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, ১৯৮০।
4. ক্ষেত্র-সমীক্ষা: ক্ষেত্র-সমীক্ষায় বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন:

   ক) দিবাকর জানা - স্থানীয় বাসিন্দা, বাগডাঙ্গা, মৌশুনী।

   খ) শ্রীকান্ত পাল - স্থানীয় বাসিন্দা, বাগডাঙ্গা, মৌশুনী।

   গ) গোপাল বৈদ্য - পাঁচু গোপাল মন্দিরের পুরোহিত, বাগডাঙ্গা, পূর্বঘেরী, বাগডাঙ্গা মৌশুনী।

   ঘ) পুলক রঞ্জন দাস - অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, শিবানী মন্ডল মহাবিদ্যালয়, নামখানা।

সাগরমেলা ও ঘোড়ামারা দ্বীপ

Author: Suranjana Ghorai, Department of Bengali, Semester - VI, Sibani Mandal Mahavidyalaya

ভূমিকা এবং সাগরদ্বীপ: পশ্চিমবঙ্গের দঃ ২৪ পরগনা জেলার সাগর ব্লকের একটি ছোট্ট দ্বীপ হলো ঘোড়ামারা দ্বীপ। সাগর ও ঘোরামারা—এই দুটি দ্বীপের সঙ্গে সমুদ্রের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। এই ঘোড়ামারা দ্বীপটি পূর্বে সাগরদ্বীপের সাথে পুরোপুরি যুক্ত ছিল কিন্তু বর্তমানে একটি স্বতন্ত্র দ্বীপ হিসেবে পরিচিত। তবুও এখনো পর্যন্ত ঘোড়ামারার অধিবাসীদের যে কোনও দরকারে সাগরে যেতে হয়।

ঘোড়ামারা হল সুন্দরবনের একটি দ্বীপ যা কলকাতা থেকে ৯২ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। এটি সুন্দরবনের গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চলের অংশ। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দ্বীপটি ধীরে ধীরে ক্ষয় ও ডুবে যাওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। হুগলি নদী আর মুড়িগঙ্গা-ঘেরা ঘোড়ামারা দ্বীপের আয়তন একসময় ছিল ২১ বর্গ কিমি এবং জনসংখ্যা ছিল ৫০০০-র বেশি। জোয়ারের আঘাত আর মালবাহী জলযানের তোলা ঢেউ প্রতিদিন আছড়ে পড়ছে; ফলে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার এই অসাধারণ দ্বীপটির চারিদিক প্রতিদিন আহত হচ্ছে। প্রশাসন এই দ্বীপের ক্ষয়রোধ করার জন্য ভেটি-ভার নামক বিশেষ ঘাস লাগিয়েছে। বোল্ডার ফেলেও ক্ষয়রোধ করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু করা সম্ভব হচ্ছে না। এখন ঘোড়ামারা গ্রামের কিছু বাসিন্দা পুনর্বাসন মিলবে এই আশায় আছে, কারণ ঘোড়ামারা অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক দিক থেকে অনেক পিছিয়ে আছে।

এবার আসি সাগরদ্বীপের কথায়। এটাও সুন্দরবনের একটি অংশ এবং গাঙ্গেয় বদ্বীপের একটি অংশ। এটি পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ প্রান্তে বঙ্গোপসাগরের মোহনায় অবস্থিত। কলকাতা থেকে প্রায় ১৩৫ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল হিন্দু তীর্থস্থান কপিলমুণির মন্দির। সেখানে প্রতিবছর মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগর মেলা অনুষ্ঠিত হয়। অনেক তীর্থযাত্রীর সমাগম হয় এই মেলায়। সর্বশেষে বলা যায়: সাগরদ্বীপ পর্যটকদের জন্য একটি আকর্ষণীয় স্থান। সাগরদ্বীপে যাওয়ার সময়ে ডানদিকে পড়ে ঘোড়ামারা দ্বীপ। একসময়ের সাগরদ্বীপের অংশ ছিল। এটি কিন্তু ভাঙনের ফলে দুটি দ্বীপের মাঝে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছে সমুদ্র। দুটি দ্বীপই হুগলির মুরিগঙ্গা দ্বারা আবৃত এবং পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণে অবস্থিত। দুটি দ্বীপের মাঝে এত মিল থাকা সত্ত্বেও সাগরদ্বীপের সবচেয়ে আকর্ষণ গঙ্গাসাগর মেলায় ঘোড়ামারাবাসীরা অংশ নিতে পারে না।

সবচেয়ে বড় কারণ হলো নদীর ভাঙন। নদীর ভাঙনের ফলে ঘোড়ামারাতে তেমন পর্যটন ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারেনি। বা গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। ঘোড়ামারা দ্বীপে সঞ্চয় অপেক্ষা ক্ষয় বেশি তাই পর্যটকদের কাছে তেমন আকর্ষণ হয়ে ওঠেনি। বা কোনও কারণে অজানা রয়েছে। তবু ঘোড়ামারাবাসীরা, গঙ্গাসাগর মেলায় সীমিত হলেও অংশ নিতে পারে।

গঙ্গাসাগর মেলায় ঘোড়ামারাবাসীরা প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিতে না পারলেও পরোক্ষভাবে অংশ নেয় এবং মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গা স্নান করে। ঘোড়ামারা থেকে অনেকে ভলেন্টিয়ার হয়ে প্রশাসনের কাজে গঙ্গাসাগরে যায়। মেলাটি সুরক্ষিত রাখতে ঘোড়ামারাবাসীদের অল্প হলেও অবদান আছে কিন্তু পুরোপুরিভাবে তারা মেলাটি উপভোগ করতে পারে না। এই বিষয়টি ঘোড়ামারাবাসীরা মেনে নিয়েছে। তাদের মধ্যে গঙ্গাসাগর মেলার যেটুকু প্রভাব পড়ে, সেইমতো তারা আনন্দ করে। সাগরের অংশ ঘোড়ামারা হওয়া সত্ত্বেও মেলাটি বসে নামখানাম, লট নম্বর ৮ সংলগ্ন স্থানে। সাগরেতে অনুষ্ঠিত হয় ঠিকই কিন্তু শুধুমাত্র একটি নদীর ব্যবধানে ঘোড়ামারা দ্বীপ বঞ্চিত আছে গঙ্গাসাগর মেলার আনন্দ উপভোগ করার থেকে।

প্রশাসন ব্যবস্থা পরবর্তীকালে সচেষ্ট হলেই দ্বীপটি আকর্ষণীয় না হলেও ভাঙনের হাত থেকে বাঁচবে। তা হলে মানুষকে আর গৃহহীন হতে হবে না বা পুনর্বাসনের অপেক্ষায় দিন গুনতে হবে না। এই আশায় আছে ঘোড়ামারা দ্বীপের বাসিন্দারা।

মৌশুনি দ্বীপের অর্থনৈতিক অবস্থা

Author: Sukdeb Barik, Department of History, Semester - VI, Sibani Mandal Mahavidyalaya

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিনে বঙ্গোপসাগরের মোহনায় সুন্দরবন অঞ্চলের একটি উল্লেখযোগ্য দ্বীপ হলো মৌশুনি দ্বীপ। এই দ্বীপটি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নামখানা ব্লকের মধ্যে অন্তর্গত। দ্বীপটির উত্তরে মুড়িগঙ্গা, পূর্বে চিনাই নদী, পশ্চিমে মুড়িগঙ্গা ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এই দ্বীপটিকে চারদিক দিয়ে ঘিরে রেখেছে। জলপ্রাচীর দিয়ে ঘেরা মৌশুনি দ্বীপটির বর্তমান মোট গড় আয়তন ৩০ বর্গকিলোমিটার।

মৌশুনি দ্বীপটির নামকরণ কে বা কারা করেছে তা নিয়ে সঠিক ভাবে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে মনে করা হয় যে এই দ্বীপটিতে জনবসতি স্থাপনের পূর্বে জায়গাটি ছিল জঙ্গলাপূর্ণ এবং বিভিন্ন বনজ সম্পদে পরিপূর্ণ। যেমন দামি কাঠ যেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- সুন্দরী, গরান, গেওয়াঁ, হেতাল প্রভৃতি। এছাড়াও বনজ মধু। স্থানীয় লোকেদের কাছ থেকে জানা যায় যে এই দ্বীপে বসতি স্থাপনের সময় লোকেরা প্রায়সই মৌমাছির গুঞ্জন শুনতে পেত। সম্ভবত মাছির গুঞ্জন থেকে এই দ্বীপের নামকরণ করা হয় মৌশুনি। এছাড়াও অনেকে মনে করেন যে দ্বীপটিতে মৌসুমী বায়ু বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে জলীয়বাষ্প সংগ্রহ করে প্রথম বৃষ্টিপাত ঘটায়, তাই এই দ্বীপের নামকরণ মৌশুনি রাখা হয়েছে।

সমগ্র মৌশুনি দ্বীপটিকে ৪টি মূল ভূখণ্ডে ভাগ করা হয়েছে ১. পয়লাঘেরী ২. বাগডাঙ্গা ৩. কুসুমতলা ৪. বালিয়াড়া। এই চারটি ভূভাগকে আবার কতগুলি সোয়ালে ভাগ করা হয়েছে। সমগ্র দ্বীপে প্রায় ৬০ থেকে ৭০ টি সয়াল রয়েছে। এই সোয়ালগুলি চিহ্নিত করার জন্য পূর্বে চিনাই নদীর তীর থেকে পশ্চিমে মুড়িগঙ্গার তীর পর্যন্ত মাটির উঁচু রাস্তা বানানো হয়। এগুলি মূলত দ্বীপের অধিবাসীদের যাওয়া আসার রাস্তা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। রাস্তাগুলো সাম্প্রতিক সময়ে উন্নতির ফলে কংক্রিটের ও কিছু কিছু রাস্তা ইটের তৈরি হয়েছে। মৌশুনি দ্বীপের এই চারটি মূল ভূভাগকে পরিচালনা করার জন্য বাগডাঙ্গা খাসমহল মাঠে একটি মাত্র গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে। দ্বীপটির বর্তমান মোট জনসংখ্যা ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী------

মৌজা বা গ্রাম	আয়তন (হেক্টর)	পরিবার	জনসংখ্যা			তপশিলী জাতি			তপশিলী উপজাতি		
			মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা
মৌশুনী	৫০০.০৭	৭২৩	৩৫৭৮	১৭৮০	১৭৪৮	১৭৬	৯১	৮৫	৫২	২৮	২৪
বালিয়ারা	১২১০.২২	১৭৪৬	৮৬৭২	৪৩৫৮	৪৩১৪	১৩৪৮	৭০৮	৬৪০	২০৪	৯৩	১১১
বাগডাঙ্গা	৬১১.৩৮	৯০১	৪১৬০	২১৩৪	২০৬৬	৭৫১	৩৭৯	৩৭২	৫৩	২৫	২৮
কুসুম দোলা	৮৮.৭৮	১২৮৯	৫৬৬৩	২৮৯৮	২৭৬৫	১৮৬১	৯৪৬	৯১৫	৪২	২০	২২

Source: Census of India 2011, west Bengal, series - 20, part - XII, PCA, P. 516 & 517

শান্ত নিরিবিলি মৌশুনি দ্বীপটিতে হিন্দু, মুসলিম ও আদিবাসী সম্প্রদায় নিজ নিজ সংস্কৃতি নিয়ে বসবাস করে। এদের মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায় হল সংখ্যাগরিষ্ঠ। তারপরে রয়েছে মুসলিম ও কিছু আদিবাসী সম্প্রদায়, যারা দ্বীপটির বালিয়াড়া এবং পয়লাঘেরীতে বসবাস করে। মৌশুনি দ্বীপের অধিকাংশ মানুষ মেদিনীপুর ও কিছু হাওড়া, হুগলি প্রভৃতি স্থান থেকে এসেছে। এবং এখানে স্থায়ী বসতি স্থাপন শুরু করেছে।

মৌশুনি দ্বীপটিতে কবে থেকে বসতি স্থাপন শুরু হয়েছে তা নির্দিষ্টভাবে কোন তথ্য না পাওয়া গেলেও মনে করা হয় আনুমানিক ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ মানুষ এখানে এসে বসবাস শুরু করে। যার প্রমাণ আমরা পাই দ্বীপটির কেন্দ্র মৌশুনি বাগডাঙ্গা অঞ্চলে অবস্থিত একটি ব্রিটিশ আমলের খাসমহল। যেটি বর্তমানে প্রায় জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। স্থানীয় গ্রামবাসীদের কাছ থেকে জানা যায় যে, ব্রিটিশরা এই দ্বীপে সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতো। দ্বীপটিতে আবাদ সৃষ্টির জন্য কোন জমিদারকে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়নি। এর পরিবর্তে ব্রিটিশ সরকার পুরো দ্বীপটিকে নিজেদের অধীনে রাখে। ব্রিটিশ সরকার নিজ উদ্যোগে মেদিনীপুর,ছোটনাগপুর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে কর্মঠ মানুষদের এনে জঙ্গল পরিষ্কার করে লোক বসতি স্থাপন করে। পুরো দ্বীপটিকে জরিপ করে জল নিকাশি এবং রাস্তাঘাট তৈরি করে। রাস্তাগুলো লম্বালম্বি ভাবে পরস্পরকে ছেদ করেছে। জরিপ করে দেখা গেছে দ্বীপের মাঝখানের স্থান হল বর্তমান বাগডাঙ্গা। তাই সরকার বাগডাঙ্গাতেই কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের জন্য একটি খাসমহল নির্মাণ করে। সে সময় পানীয় জলের খুব সংকট ছিল, তাই গ্রহণযোগ্য পানীয় জলের জন্য খাসমহলের পাশে একটি বড় পুকুর কাটা হয়, যেটা এখনো বর্তমান। এই অঞ্চলের প্রত্যেক ব্যক্তিকে ৫,১০,১৫,২০ বিঘা জমি দিয়েছিল। বাগডাঙ্গা তে একটি উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে যেটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৩৭ সালে। ব্রিটিশদের সময়কালে এই বিদ্যালয়টির নাম ছিল M.E স্কুল। পরে এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় মৌশুনি কো-অপারেটিভ হাই স্কুল। এই উচ্চ বিদ্যালয়টি সেই সময়কার নামখানা ব্লকের মধ্যে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হাই স্কুল। মৌশুনি দ্বীপের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী এই বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে আসে।

মৌশুনি দ্বীপের অর্থনৈতিক সমাজ ছিল মূলত কৃষিভিত্তিক। মৌসুমী জলবায়ুর অন্তর্গত হওয়ায় বর্ষাকালে এখানে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়। আর এই বর্ষার জলের ওপর নির্ভর করে এই দ্বীপের ৭০% মানুষ ধান চাষ করে থাকে। দ্বীপটি সমুদ্র সংলগ্ন পলিদ্বারা গঠিত হওয়ার কারণে খুব ভালো ধান চাষ হয়ে থাকে। তবে দুঃখের বিষয় দ্বীপটি নদী দ্বারা বেষ্টিত হওয়ায় বর্ষাকালে নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পেলে লবণাক্ত জল দ্বীপটির মধ্যে প্রবেশ করে। ফলে কৃষকদের সেই সময় খুব ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। বর্ষার ধান মাঠ থেকে উঠে যাওয়ার পর বিভিন্ন অর্থকারী ফসল যেমন- ঝিঙ্গে, উচ্ছে, লঙ্কা প্রভৃতি চাষ করা হয়ে থাকে। এই অর্থকারী ফসলগুলি চাষ করে দ্বীপের মানুষজন ছোটো বড়ো নৌকা নিয়ে নামখানা, কাকদ্বীপ, প্রভৃতি স্থানে বাজারজাত করে। যেখান থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ মানুষজনের হাতে আসে। এমনকি প্রয়োজনীয় খাদ্যের উপকরণ হিসাবে আলু, পেঁয়াজ এবং কিছু দানা জাতীয় শস্য যেমন - সূর্যমুখী, তিল, সরষে, মুগডাল চাষ করা হয়ে থাকে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে কৃষিকাজের উন্নতির জন্য পুকুর, ঝিল প্রভৃতি স্থানে বর্ষার জল ধরে রেখে গ্রীষ্মকালে বিক্ষিপ্তভাবে বেশ কিছু জায়গায় বোরো ধান চাষ করা হয়ে থাকে। যাকে স্থানীয় ভাষায় খরাটি ধান চাষ বলে। যা মৌশুনি দ্বীপের অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করে তোলে। এমনকি বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে তাল ও খেজুর গাছের রস থেকে গুড় তৈরি করেও বিক্রি করে কিছু মানুষ। এছাড়াও দ্বীপটি সুন্দরবন সংলগ্ন হওয়ার কারণে ম্যানগ্রোভ অরণ্য থেকে বিভিন্ন বনজ সম্পদ বিশেষ করে মধু সংগ্রহ করে তা বিক্রি করে। যা স্থানীয় জনগণের অর্থ উপার্জনের একটি প্রধান উৎস। এমনকি এই দ্বীপের মহিলারা হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগল, শুকর ইত্যাদি প্রতিপালন করে অর্থ উপার্জন করে থাকে।

মৌশুনি দ্বীপের মানুষজনের জীবিকা অর্জনের আরো একটি উল্লেখযোগ্য পথ হলো মৎস্য শিকার ও সামুদ্রিক কাঁকড়া সংগ্রহ। এই দ্বীপের মোট জনসংখ্যার আনুমানিক ২০% মানুষ মৎস্য শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করে। দ্বীপটি নদী দ্বারা বেষ্টিত হওয়ার দরুন ও মোহনা সংলগ্নের ফলে ছোট ও বড় নৌকা দিয়ে মৎস্যজীবীরা নদী ও সমুদ্র থেকে প্রচুর পরিমাণে মাছ সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করে। যেখান থেকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ মানুষজনের হাতে আসে। এছাড়াও কিছু ছোট ছোট জেলে ও মাছ চাষিরা রয়েছে, যারা নদীতে মিন ও ছোট চিংড়ি ধরে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এই মিন ও ছোট

চিংড়িকে স্থানীয় ভাষায় ভুড়িচিংড়ি বলে। এগুলিকে ধরার জন্য পুরুষের পাশাপাশি মহিলারা ও যোগদান করে থাকে। তবে সাম্প্রতিককালে মাছ চাষের উন্নতির কারণে কিছু কিছু মানুষ ছোট খাটো ঝিল, ভেড়ি এবং পুকুর তৈরি করে বড় চিংড়ি ও ভেনামি চাষ করে বাজারজাত করার জন্য। যা মৌশুনি দ্বীপের অর্থনীতিকে আরো মজবুত করে।

এছাড়াও মৌশুনি দ্বীপের অর্থনীতির আর একটি মূল উৎস হল পর্যটনকেন্দ্র। যেটি সাম্প্রতিক সময়ে দ্বীপটির দক্ষিণ প্রান্তে বালিয়াড়া সল্টঘেরী অঞ্চলে সৃষ্টি হয়েছে। দ্বীপটি সমুদ্র সংলগ্ন হওয়ার কারণে সমুদ্রসৈকত, বালিয়াড়ি ও সূর্যাস্তের মত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য বহু দূর থেকে প্রকৃতি প্রেমীরা এখানে ছুটে আসে, যা দ্বীপটিকে গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত করেছে। এখান থেকে মোট জনসংখ্যার আনুমানিক ৫% মানুষ জীবিকা ও অর্থ উপার্জন করে থাকে। শীতকালে এখানে বেশ কিছু পরিযায়ী পাখি লক্ষ করা যায়, যা প্রকৃতি প্রেমিকদের এখানে আসতে উৎসাহিত করে। এই পর্যটকদের আসা-যাওয়াকে কেন্দ্র করে দ্বীপটিতে প্রগতিশীল রিকশা যেমন - টোটো, ভ্যান প্রভৃতি গড়ে উঠেছে। যা মৌশুনি দ্বীপের অর্থনীতির একটি বড় অংশ।

মৌশুনি দ্বীপের মোট জনসংখ্যা আনুমানিক ৫% মানুষ পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। এদের মধ্যে কিছু জন বিদেশে যায় যেমন কুয়েত, দুবাই, কাতার, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি জায়গায় এবং বেশিরভাগ পরিযায়ী শ্রমিক মৌশুনি দ্বীপের বাইরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে যেমন কলকাতা, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ, গুজরাট, কেরল, তামিলনাড়ু, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি জায়গায় কাজ করে অর্থ উপার্জন করে থাকে। যা মৌশুনি দ্বীপের অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করে।

চারিদিকে জলবেষ্টিত মৌশুনি দ্বীপটির মানুষজন ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই কাজ শুরু করে এবং সূর্য ডোবার সাথে সাথে কাজ শেষ করে। সাম্প্রতিক সময়ে দ্বীপটিতে বিদ্যুতের আলো আসলেও এখানকার মানুষের কাজের তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি। বিদ্যুতের আলো আসার পূর্বে বাগডাঙ্গা ও বালিয়াড়া বাজারে সন্ধ্যের পর কিছু কিছু দোকান খোলা থাকতো, কিন্তু বিদ্যুতের আলো আসার পর বাগডাঙ্গা ও বালিয়াড়ার বাজারসহ দ্বীপটির বিভিন্ন জায়গার মোড়ে ছোটখাটো বেশ কয়েকটি দোকান নিয়ে মিনি বাজার সৃষ্টি হয়েছে। দ্বীপটিতে মানুষজনের চিকিৎসার জন্য একটি হাসপাতাল আছে, বাগডাঙ্গা ও বালিয়াড়া বাজারে ছোটখাটো ঔষধ-দোকানও রয়েছে। বড় কোন শারীরিক সমস্যা হলে পূর্বে চেনাই নদী পেরিয়ে নিকটবর্তী গ্রামীণ হাসপাতাল দ্বারিকনগরে যেতে হয়। যাইহোক নামখানা ব্লকের অন্যান্য অঞ্চলের থেকে এই দ্বীপের অধিবাসীগণ শান্তিপূর্ণভাবে একে অপরের সঙ্গে মিলেমিশে বসবাস করে।

ঋণস্বীকার:

1. মন্ডল, নাজিবুল ইসলাম (সম্পাদিত), সমকালের জিয়ন কাঠি, (ড. দয়াল চাঁদ সরদার - জীবন ও জীবিকার মৌশুনী) সাগরদ্বীপের কথা, জানুয়ারি - জুন ২০১৯।
2. ঘোষ, বিনয় - " বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা", প্রকাশ ভবন, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৮।
3. 2011, জনগণনা - Source: Census of India 2011, West Bengal, Series -20, Part - XII, PCA, P. 516 & 517
4. ক্ষেত্র সমীক্ষা - ক্ষেত্র সমীক্ষায় বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন -
   ক) পুলক রঞ্জন দাস - অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, শিবানী মন্ডল মহাবিদ্যালয়, নামখানা।
   খ) সুবোধ কুমার পাত্র - স্থানীয় বাসিন্দা, পয়লাঘেরি, মৌশুনী।
   গ) মানস দাস - স্থানীয় বাসিন্দা, পয়লাঘেরি, মৌশুনী।
   ঘ) বিশ্বজিৎ নাইয়া - অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, শিবানী মন্ডল মহাবিদ্যালয়, নামখানা।

ইয়াস: প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও ঘোড়ামারা

Author: Susmita Bhunia, Department of Bengali, Semester - VI, Sibani Mandal Mahavidyalaya

পৃথিবী সৃষ্টির আদি থেকেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ একটি আকস্মিক ও অনিবার্য ঘটনা প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে এখনো পর্যন্ত প্রকৃতির এই ভয়াল তাণ্ডব লীলা অব্যাহত। তেমনি ঘূর্ণি ঝড় ইয়াস সুন্দরবনের ওপর একটি বড় প্রভাব ফেলেছিল বিশেষ করে ঘোড়ামারা দ্বীপের ওপর ঘূর্ণিঝড় ইয়াস ২০২১ সালে ২৬ শে মে সকাল 9:30 থেকে 10:30 নাগাদ আছড়ে পড়ে। সুন্দরবনের উপর যার ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ঘোড়ামারা দ্বীপ যা স্থানীয়দের জন্য একটি বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছিল ইয়াসের প্রভাবে বাঁধ ভেঙে যাওয়ার কারণে ব্যাপক বন্যা হয়। যা ঘোড়া মারার মতো উপকূলীয় এলাকাগুলিকে প্রভাবিত করে। এই দুর্যোগে অনেক মানুষ তাদের ঘরবাড়ি ও জীবিকা হারায় l

ঘোড়ামারা দ্বীপ হলো ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সুন্দরবন এলাকার একটি দ্বীপ। দ্বীপটি বর্তমানে ভাঙ্গন সমস্যার সম্মুখীন। দ্বীপটি হুগলি নদীতে মুড়িগঙ্গা নদীর উৎস মুখে অবস্থিত সাগর ব্লকের এই ঘোড়ামারা দ্বীপে ইয়াসের আগে ছিল প্রায় ১১৪৬ টি পরিবার জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৫৬০০ এর মতো রয়েছে প্রাইমারি স্কুল হাই স্কুল পঞ্চায়েত অফিস পোস্ট অফিস প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র সফলতা আসে জমি একটা সচ্ছল জনপদে যা থাকে তার সবই আছে কিন্তু দ্বীপের আয়তন ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে রোজ নদীগর্ভে চলে যাচ্ছে তার সম্পদ। আনুমানিক 1959 সাল থেকেই দ্বীপের ভাঙ্গন শুরু হয়েছে। প্রথম থেকে সামান্য ভাঙ্গন হয়, তা সামাল দেওয়া গিয়েছিল ২০১০ সালের পর থেকে দ্বীপের উত্তর পূর্ব দিকে প্রবল ভাঙ্গনের কারণে বাঁশ, বালির বস্তার বাঁধ দিয়ে সামলানো যায়নি ভাটায় মুড়ি গঙ্গার প্রবল স্রোত এবং জোয়ারে সমুদ্রের ঢেউ এই দুইয়ের কবলে দীর্ঘদিন ধরে ভাঙ্গন কাজ চলছে এখানে।

প্রশাসনের হিসাবে 130 বর্গ কিলোমিটার থেকে খোয়ে খোয়ে এখন দ্বীপের আয়তন দাঁড়িয়েছে মাত্র ২৫ বর্গ কিলোমিটার যার বেশিরভাগ এলাকা আবার উপকূল সংলগ্ন ইতিমধ্যে অনেকে দ্বীপ ছেড়ে পুনর্বাসন নিয়েছে। কেউ পালিয়েছেন আরো দূরে। দ্বীপ সমস্ত ছোট হয়েছে। ঘোড়ামারা দ্বীপের ভাঙ্গন ঠেকাতে নানাবিধ প্রকল্প হাতে নিয়েছিল সরকার। কখনো গাছ বসিয়ে কখনো খাঁচা লাগিয়ে ভূমিক্ষয় আটকানোর চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু কাজে দেয়নি কিছুই সম্প্রতি এই দ্বীপে বিশেষ ধরনের এক ঘাস ভেটিভার লাগিয়ে মাটি ক্ষয় রোধের চেষ্টায় নেমেছিলেন প্রশাসন বাকি প্রকল্পগুলির মত এই প্রকল্পেও ব্যর্থ হয় প্রশাসন। কোনভাবেই ঘোড়ামারার ভাঙ্গন আটকানো যায়নি তবুও চেষ্টায় রয়েছে প্রশাসন। নতুন কোন পদ্ধতি গ্রহণ করে যাতে ঘোড়া মারার ভাঙ্গন ঠেকানো যায় ঘোড়ামারার ভাঙ্গনের পেছনে যেমন নদীর খরস্রোতের প্রভাব রয়েছে তেমনি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও তার একটি অন্যতম কারণ আয়লা, আমপান, বুলবুল এর মত ঘূর্ণিঝড় গুলোও ঘোড়ামারা ধ্বংসের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আইলা আমফানের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোকে ছাপিয়ে গেছিল ইয়াস ঘূর্ণিঝড়। ঘূর্ণিঝড় ইয়াসে সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চল গুলি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ঘোড়ামারা দ্বীপ।

ঘূর্ণিঝড় ইয়াসের বার্তা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হয় অঞ্চল বাসীর তোর জোর যে যতটা সম্ভব করেছে তাদের জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখার বেশিরভাগ যেহেতু কাচা বাড়ি আবারো যাদের পাকা বাড়ি রয়েছে তাদের বাড়ির চাল হয় টালির নয়তো অ্যাসবেস্টাস কিংবা টিনের চালগুলি যাতে উড়ে না যায় ঝরে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্যস্ত সকলে। বাড়ির মেয়েরা দরকারি কাগজপত্র লাইট ফোন গুছিয়ে রাখে যত্নে। পাড়ায় পাড়ায় শুরু হয় মাইকে প্রচার। এলাকাবাসী যাতে নিরাপত্তায় থাকে তার জন্য প্রশাসনিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। মাইকে প্রচারের মাধ্যমে কিছু মানুষকে সরিয়ে নিয়ে

যাওয়া হয়। সাগরের বামন খালি স্কুলে তবে ভিটেমাটি ছেড়ে সবাই গেল না বেশিরভাগ বয়স্ক মানুষ এবং শিশুরা গেল বাড়ির যে সকল খাদ্য সামগ্রী, যা তাদের সারা বছরের সংরক্ষণ যেমন চাল ডাল জামাকাপড় ইত্যাদি বাড়ির মধ্যে খাটের উপর রেখে ত্রিপল ঢাকা দিয়ে রাখে যাতে বাড়ির চাল উড়ে গেলেও ভিজে না যায়। কিন্তু কে জানতো নদীর জল এসে সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যাবে জলোচ্ছ্বাসের পূর্বাভাস দিয়েছিল আবহাওয়া দপ্তর তবে এতটা ভয়ঙ্কর হবে কেউ বুঝতে পারেনি। তারপর এল সেই অভিশপ্ত আতঙ্কের দিন ২৬ শে মে সকাল সকাল থেকে পরিবেশ ছিল থমথম ঝড় আসার আগে যেমন থমথমে থাকে তেমনি অবস্থা থাকে সকাল থেকে এলাকাবাসী ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ে কেউ কেউ তাদের সরকারি কাগজপত্র এবং শুকনো খাবার নিয়ে নিরাপদ আশ্রয় ফ্ল্যাড শেলটার কিংবা স্কুলগুলোতে আশ্রয় নেয়, যাতে নিরাপদে থাকে। কেউ কেউ গৃহপালিত পশুদেরও নিয়ে যায়, আবার নদীর কাছে বসবাসকারী মানুষজনেরা নদীর ধারে পুকুর থেকে মাছ ধরে ভেতরের দিকে পুকুরে রাখতে ব্যস্ত। যাতে জলোচ্ছ্বাস হলেও মাছগুলো যাতে ভেতরের পুকুর থেকে বেরিয়ে না যায় কিন্তু নদীর জলোচ্ছ্বাসে পুরো এলাকা প্লাবিত করে দেবে তা স্বপ্নেও ভাবেনি ঘোড়ামারারবাসীগণ ঠিক সকাল ৯টা ৩০ থেকে দশটা নাগাদ জলোচ্ছ্বাস শুরু হয়। জলের উচ্চতা এতটাই ছিল যে নদীর বাঁধ না ভেঙ্গে তার উপর থেকে জল আসতে শুরু করে। চারিদিকে পড়ে যায় হাহাকার চিৎকার যে যেদিকে পারে ছুটে গিয়ে উঁচু স্থানে উঠে পড়ল। কেউবা উঠল গাছের ওপরে চারিদিকে উঠল কান্নার রোল দ্বীপবাসী কিছু বুঝে ওঠার আগেই মাত্র ১০ মিনিটে পুরো দ্বীপ জলমগ্ন হয়ে গেল। তিন দিকে বটতলা হুগলী মুড়িগঙ্গা বেষ্টিত ঘোড়ামারা দ্বীপ ইয়ার্সে ওলট পালট হয়ে গিয়েছিল। ভেসে গিয়েছিল সবকিছু। অঙ্গে পরিধান করা বস্ত্রটুকু ছাড়া আর কিছু ছিল না। একটু যখন জলোচ্ছ্বাস কমলো চারিদিকে শোনা গেল হাহাকার। চিৎকার ক্ষুধার জ্বালায় সবাই ছটফট করতে লাগলো উঁচু পাড়ের উপর বসবাসকারী কয়েকটি বাড়িতে জল ঢুকলেও তেমন কোন ক্ষতি হয়নি। মোটামুটি রান্না করা যাবে তাদের বাড়িতে রান্না হল ভাত। সবাই খিদের জ্বালায় ছুটলো ভাত খেতে। শোনা গেল শিশুদের ক্রন্দন, একটু ভাত দেবে গো।

ভিটেমাটি জমি গলা ভরা ধান সবই ভেসে গেছে নোনা জলে নদী ক্রমশ গিলে নিচ্ছে দ্বীপ টিকে ইয়াস আসার পর পাঁচ দিন কেটে গেলেও ঘোড়ামারা দ্বীপের বহু জায়গায় তখন শুধু জল আর জল ছিল। ঘূর্ণিঝড়ের আতঙ্ক সত্ত্বেও অনেকেই ভিটেমাটি আর শেষ সম্বল টুকু আঁকড়ে পড়েছিলেন তখনও জল না নামায় থাকা খাওয়ার চিন্তায় ঘুম উড়েছে। তাদের দ্বীপের বাসিন্দা অগত্যা নিরুপায় হয়েই একে একে ভিটেমাটি ছাড়তে শুরু করেছেন সর্বস্ব ভেসে গিয়েছে ধ্বংসস্তূপের ওপর বসে স্মৃতিচারণ ছাড়া আর উপায় নেই। কারো ঠাঁই খোলা আকাশের নিচে কেউ জলে ডোবা সংসারে তন্ন তন্ন করে খুঁজেই চলেছে শেষ সম্বল। অল্প রোদের মুখ দেখতেই কেউ ব্যস্ত ধান শুকানোয়, যতটুকু বাঁচানো যায় আর কি। তিন চার দিন ভাতের মুখ দেখেনি কেউ, কেড়ে নিয়েছে ইয়াস সবকিছু রেখে গেছে ক্ষত চিহ্ন। এই ক্ষত কবে শোকাবে তা জানে না মানুষগুলো বঙ্গোপসাগর আর মুড়িগঙ্গা নদী দিয়ে ঘেরা এই ঘোড়ামারা দ্বীপ ঢেউয়ের মাথায় বাস করা এই মানুষগুলোর জীবন এক নিমেষে তলিয়ে দিয়েছে। ঘূর্ণিঝড় ইয়াসের ৫ দিন পর কিছু কিছু জায়গায় জল নামলেও বহু এলাকা জনমগ্ন ছিল। নিমেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে কাঁচা বাড়ি, যেগুলো টিকে গেছে তা-ও জলে থৈথৈ। উঁচু রাস্তার পাশে ত্রিপলটা নিয়ে ঠাঁই নিয়েছেন কেউ। কারো আবার সেটুকুও জোটেনি পানীয় জল থেকে খাবার সংকট। এ দ্বীপের সবটাই এখন গ্রাস করেছে একরাশ হাহাকার সমস্যা এতটাই যে অনেকেই চলে গেছেন এ দ্বীপ ছেড়ে। বাসিন্দারা বলেছিলেন আমাদের খাওয়ার জায়গা নেই। কোথায় যাব যাদের জায়গা আছে চলে যাচ্ছে গরু ছাগল মরে গেছে জমা জ্বলে দুর্গন্ধ সব শেষ হয়ে গিয়েছিল কেউ সাহায্য না করলে ঘুরে দাঁড়ানোর উপায় ছিল না দ্বীপবাসীর কবে ফের আগের মতো ছন্দে ফিরবে জীবন অপেক্ষায় গুমড়ে কাঁদছে ঘোড়ামারা। প্রকৃতির রুদ্র রূপ কত রুক্ষ হতে পারে তা মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা দিয়ে উপলব্ধি করেছে ঘোড়ামারার দুটি পরিবারের বাচ্চু জানা

আর রুহুল আমিন গায়েন দুই পরিবারই ঘোড়ামারা দ্বীপের বাসিন্দা ঢেউয়ের মাথায় বাস করা মানুষগুলির মধ্যে একটি পরিবার হল জানা পরিবার গৃহকর্তা ছিলেন ৭৫ বছরের বৃন্দাবন জানা পরিবার সূত্রে জানা যায় ইয়াস আছড়ে পড়ার দিন সকালে ঢেউ দেখে সবাইকে সতর্ক করতে বেরিয়েছিলেন তিনি শেষ পর্যন্ত জলোচ্ছ্বাসে তলিয়ে যান। নিজেই পরে ভেসে ওঠে তার মৃতদেহ। একদিকে বাবাকে হারিয়ে শোকোস্তব্ধ ছেলে, অন্যদিকে নিখোঁজ ছেলের পথ চেয়ে-থাকা এক বাবা। ২৬ শে মে এর ভরা কোটালে গ্রামে জল ঢুকতে দেখে ঘর ছাড়তে শুরু করে রুলামিন এর পরিবার। পরিবার সূত্রে জানা যায় সেই সময় জলের খরস্রোতে বাবার হাত ফসকে চলে যায় তার দেড় বছরের সন্তান। নিখোঁজ ছিল শিশুটি কয়েক দিন। তল্লাশি চলছিল। তিন চার দিন পরে শিশুটির দেহ মেলে।

ঘূর্ণিঝড় ইয়াসের প্রভাবে কিছুদিনের মধ্যে খাসিমারা নিম্নবেরিয়া অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়টি নদী গর্ভে তলিয়ে যায়। ফলে এই গ্রামে শিশুদের পড়াশোনার কি হবে তা প্রশ্নের মুখে পড়ে পঞ্চায়েতে খবর দেন। শুধুমাত্র পঞ্চায়েতে দ্বারা তো বিদ্যালয় নির্মাণ করা সম্ভব নয় তাই পঞ্চায়েত খবর পাঠান সাগর ব্লকে বর্তমানে বিদ্যালয়টি পুনরায় নির্মাণ করা সম্ভব হয়ে উঠেছে সম্পূর্ণ প্রশাসনিক এবং এলাকাবাসীর প্রচেষ্টায় শিশুদের মুখে ফুটেছে হাসি বিদ্যালয়ে শোনা যায় শিশুদের কলরব। ইয়াসের ফলে বহু বাসিন্দা ঘরবাড়ি ও জীবিকা হারায়। তাই তারা জীবিকা নির্বাহের জন্য ঘর ছেড়ে প্রবাসে পাড়ি দিয়েছে। কেউ কেউ পরিবার নিয়ে বাইরে থাকছেন। ঘোড়ামারা দ্বীপের বর্তমান পরিবার সংখ্যা ৯৫৬ এবং জনসংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ৪৩৬৬ জন। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে স্থানীয় সরকার ঘোড়ামারা দ্বীপের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে অনেক ঘুমহীন পরিবারকে সাগরদ্বীপের বিভিন্ন স্থানে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে।

সুন্দরবনের ঔষধি উদ্ভিদের বৈচিত্র্য, ব্যবহার

Author: Barsha Aich, Department of Bioscience, Semester – II, Sibani Mandal Mahavidyalaya

সারাংশ (Abstract)

সুন্দরবন পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য, যেখানে বিভিন্ন ধরনের ঔষধি গাছ জন্মায়। এই গবেষণায় সুন্দরবনের স্থানীয়ভাবে ব্যবহৃত ৫টি ঔষধি উদ্ভিদের তালিকা, তাদের ব্যবহৃত অংশ, প্রথাগত চিকিৎসায় ব্যবহারের ধরন । তথ্য সংগ্রহে স্থানীয় জনগোষ্ঠী, কবিরাজ, এবং পূর্ববর্তী গবেষণা প্রতিবেদন ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণাটি ঔষধি গাছের গুরুত্ব, সংকট এবং টেকসই ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তার উপর আলোকপাত করে।

মূল শব্দ: সুন্দরবন, ঔষধি উদ্ভিদ, লোকজ চিকিৎসা,

ভূমিকা

সুন্দরবন শুধু জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ নয়, বরং এর উদ্ভিদবৈচিত্র্যের মধ্যেও রয়েছে বিপুল পরিমাণ ঔষধি সম্ভাবনা। স্থানীয় জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে স্থানীয়বাসিন্দারা যুগ যুগ ধরে এই উদ্ভিদ ব্যবহার করে আসছেন নানা রোগ নিরাময়ে। তবে বন উজাড়, জলবায়ু পরিবর্তন ও অতিরিক্ত আহরণের ফলে এসব উদ্ভিদ হুমকির মুখে পড়ছে। সুন্দরবনে প্রায় ৩৫০ প্রজাতির ঔষধি উদ্ভিদ রয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি (Methodology)

এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে:

- সুন্দরবনের হেনরিআইল্যান্ড থেকেউদ্ভিদ সংগ্রহ ও চিহ্নিত করে।
- স্থানীয় কবিরাজ ও বনবাসীদের সাক্ষাৎকার।
- পূর্ববর্তী গবেষণা ও সরকারি প্রতিবেদন বিশ্লেষণ।

উদ্ভিদ চিহ্নিত করতে ব্যবহার করা হয়েছে বাংলাদেশ ন্যাশনাল হার্বারিয়ামের রেফারেন্স।

ফলাফল (Results)

তালিকাভুক্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঔষধি গাছ:

উদ্ভিদের নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	ব্যবহৃত অংশ	ব্যবহার	নমুনা
নোনা ঝাড়	Suaeda maritima	সম্পূর্ন উদ্ভিদ	হৃদরোগ	
সুন্দরী	Heritiera fomes	বাকল	ডায়রিয়া, জ্বর	
গরান	Ceriops decandra	বাকল	চর্মরোগ	
বাইন	Avicennia officinalis	পাতা	বাত, হাঁপানি	
গেওয়া	Excoecaria agallocha	মূল	ক্যান্সার	

আলোচনা (Discussion)

গবেষণায় দেখা গেছে, স্থানীয় জনগণের জন্য ঔষধি উদ্ভিদ শুধু স্বাস্থ্যসেবার উৎস নয়, বরং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ। তবে এসব উদ্ভিদের উপর বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা কম হওয়ায় অনেক সম্ভাবনা অজানাথেকে যাচ্ছে। অনিয়ন্ত্রিত আহরণ ও আবাসস্থল ধ্বংসের কারণে এই উদ্ভিদ গুলোর অনেকেই বিপন্ন।

উপসংহার (Conclusion)

সুন্দরবনের ঔষধি উদ্ভিদ শুধু স্থানীয় চিকিৎসার অংশ নয়, বরং জাতীয়ভাবে একটি সম্ভাবনাময় সম্পদ। এই সম্পদ রক্ষা ও উন্নয়নে দরকার সঠিক নীতিমালা, গবেষণা এবং স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণমূলক সংরক্ষণ উদ্যোগ।

সুন্দরবনের মাছের বিভিন্ন রোগ ও চিকিৎসা

Author: Subhajit Mondal, Faculty, Department of Zoology, Sibani Mandal Mahavidyalaya

সুন্দরবন বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য এবং একটি জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ অঞ্চল। এই অরণ্য অঞ্চলটি ভারত এবং বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এলাকাজুড়ে বিস্তৃত। সুন্দরবনের নদী, খাড়ি এবং খালগুলোতে প্রচুর মাছ পাওয়া যায় যা স্থানীয় মানুষের জীবিকা ও দেশের অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

সুন্দরবনে পাওয়া যায় এমন বিভিন্ন প্রজাতির মাছ:

১. *বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ মাছ:*

ইলিশ (Tenualosa ilisha)
ভেটকি (Lates calcarifer)
পারসা মাছ (Liza parsia)
পমফ্রেট (Pampus spp.)

২. *খাড়ি ও লবণাক্ত জলের মাছ:*

মুগিল (ধূসর মুলেট)
ট্যাংরা (Mystus spp.)
কাকিলা (Notopterus spp.)
গলদা চিংড়ি (Macrobrachium rosenbergii)

৩. ছোট দেশীয় প্রজাতির মাছ (SIS):

পুঁটি (Puntius spp.)
চেলা (Chela spp.)
মলা (Amblypharyngodon mola)

৪. *শিং জাতীয় মাছ:*

মাগুর (Clarias batrachus)
শিং (Heteropneustes fossilis)
বাঘাইর (Bagarius spp.)

৫. *বড় মাংসাশী মাছ*

চিতল (Notopterus chitala)
বোয়াল (Wallago attu)
রুই (Labeo rohita)

৬. *অন্যান্য জলজ প্রাণী:*

কাঁকড়া (Scylla serrata)

চিংড়ি (Penaeus sp.)

১. ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ(Bacterial disease)

Fig- Aronomous Bacterial infection

ক. *অ্যারোমোনাস* সংক্রমণ (আলসার রোগ)

লক্ষণ:

মাছের গায়ে ঘা, রক্তপাত, পাখনা পচা, পেট ফোলা।

কারণ:

খারাপ জলর গুণমান, আঘাত, অতিরিক্ত চাপ।

চিকিৎসা:

অক্সিটেট্রাসাইক্লিন বা ক্লোরামফেনিকল জাতীয় অ্যান্টিবায়োটিক (পশুচিকিৎসকের পরামর্শে)।

পানির গুণমান উন্নত করুন।

২–৩% নুনের জল ৫–১০ মিনিট ডুবানো।

খ. *ভাইব্রিও* সংক্রমণ

লক্ষণ: লালচে দাগ, ফুলে যাওয়া শরীর, অভ্যন্তরীণ রক্তপাত।

চিকিৎসা: ওষুধ মেশানো খাবার (Oxytetracycline বা Enrofloxacin সহ)। চুন ও পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দিয়ে পুকুর পরিষ্কার করা।

২. ছত্রাকজনিত রোগ (Fungal disease)

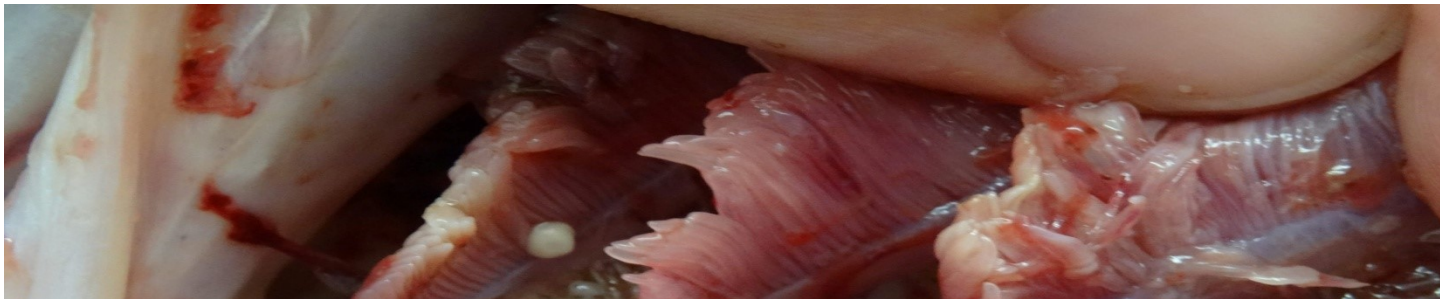

Fig- Fungal infection on gills

ক. স্যাপরোলেগনিয়াসিস

লক্ষণ: শরীর বা গিলে তুলোর মতো সাদা আস্তরণ।

কারণ: আঘাত, চাপ, অপরিষ্কার জল।

চিকিৎসা: নুন বা ম্যালাচাইট গ্রিন দিয়ে স্নান। জলের গুণমান ঠিক রাখা।

৩. পরজীবীজনিত রোগ (parasitic disease):

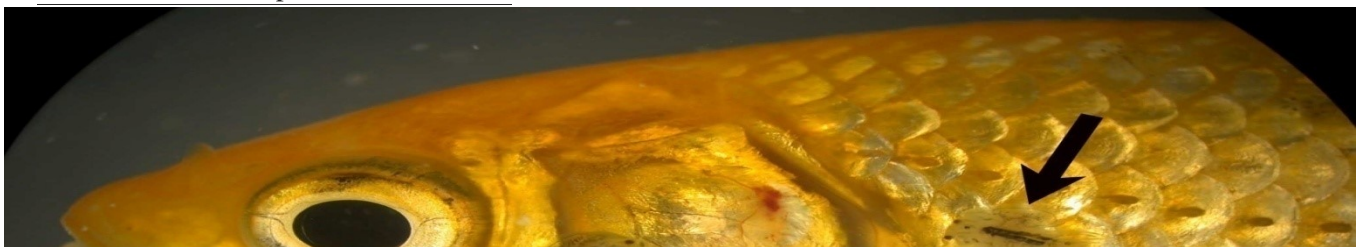

Fig- parasitic infection on operculam and body

ক. আর্গুলাস (ফিশ লাইস)

লক্ষণ: মাছ গা চুলকানো, লাল দাগ, অলসতা।

চিকিৎসা: পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট (১–২ পিপিএম) দিয়ে স্নান। গুরুতর হলে হাতে তুলে ফেলা।

খ. গিল ফ্লুকস (ড্যাকটিলোগাইরাস)

লক্ষণ: মাছ মুখ ওপরে তুলে শ্বাস নেওয়া, গিলে ক্ষতি।

চিকিৎসা: ফরমালিন স্নান (২৫ পিপিএম, ১ ঘণ্টা)। নুনের ব্যবহার।

৪. ভাইরাসজনিত রোগ (viral disease)

Fig- Harpes virus infection on gill

(এই ধরনের রোগ সুন্দরবনে কম হলেও কিছু ক্ষেত্রে হতে পারে, যেমন কোই হারপিস ভাইরাস।)

ব্যবস্থাপনা: নতুন মাছ আলাদা করে রাখা (Quarantine)। অতিরিক্ত মাছ না রাখা। জল ও পরিবেশ পরিষ্কার রাখা।

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা :নিয়মিত জল পরীক্ষা (লবণাক্ততা, পিএইচ, অ্যামোনিয়া)। অতিরিক্ত খাবার না দেওয়া। খাবারে প্রোবায়োটিক ও রোগ প্রতিরোধকারী উপাদান ব্যবহার। নিয়মিত চুন জল ব্যবহার

পাথরপ্রতিমার প্রাচীনতম শিবমন্দির

Author: Pulak Ranjan Das, Faculty, Department of History, Sibani Mandal Mahavidyalaya

পাথরপ্রতিমা ব্লকের প্রাচীনতম শিবমন্দির অবস্থিত গদামথুরার অষ্টম খন্ডে দক্ষিণ গোবিন্দরামপুর গ্রামে। ভারতীয় সুন্দরবনের মধ্যে অবস্থিত দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার একটি অন্যতম ব্লক পাথরপ্রতিমা। উনিশ শতকের শেষপর্বে পাথরপ্রতিমা তখন জঙ্গলাকীর্ণ এবং ভয়ঙ্কর জীব-জন্তুতে ভরপুর। ঔপনিবেশিক সরকার অষ্টাদশ শতকের শেষলগ্ন থেকে অধিক রাজস্ব আদায় এবং কলকাতার নিরাপত্তার জন্য জঙ্গলাকীর্ণ সুন্দরবনকে আবাদ করতে লাগল। সুন্দরবনের অধিকাংশ অঞ্চলকে 'লট' ও 'প্লট' নামে চিহ্নিত করে বঙ্গের বিভিন্ন ধনাড্য ব্যক্তিকে লীজে দিতে থাকে। পাথরপ্রতিমা ব্লকের অঞ্চলগুলি সে সময় বিভিন্ন ব্যক্তি লীজে নিতে থাকে। মেদিনীপুর জেলার মুগবেড়িয়ার জমিদার ভোলানাথ নন্দের তিন পুত্র – গোবিন্দ, দিগম্বর ও গঙ্গাধর। গঙ্গাধর নন্দ সুন্দরবনের ১১১ নং লটের কিছু অঞ্চল সরকারের কাছ থেকে লীজে নিয়ে জঙ্গল হাসিল করেন। এই অঞ্চলটি তাঁর নামানুসারে হয় গঙ্গাধরপুর। দিগম্বর নন্দ অত্যন্ত পন্ডিত ও গুণবান ছিলেন। ধর্মকর্মে বিশ্বাসী দিগম্বর নন্দ গীতা ও চন্ডীপাঠে প্রায় ব্যস্ত থাকতেন। একবার তিনি জলপথে হুগলী নদী পেরিয়ে ডায়মন্ডহারবারে এসে উপস্থিত হন। দিনটা ছিল কার্ত্তিক মাসের উত্থান একদশী। সেদিন তিনি ঘাটের কাছে একটি বট গাছের নীচে বসে সুর করে ভাগবত পাঠ করছিলেন। তাঁর সুমিষ্ঠ কণ্ঠে আকৃষ্ট হয়ে স্থানীয় এক প্রৌঢ়া তাকে তাঁর বাড়িতে আমন্ত্রণ জানান। সেই প্রৌঢ়া পরপর তিনদিন দিগম্বর বাবুর কাছে গীতা শ্রবণ করে মুগ্ধ হয়ে যান। তিনি দিগম্বর বাবুকে দক্ষিণা দিতে চাইলেন। প্রৌঢ়া জানান তাঁর পুত্র ব্রিটিশ সরকারের একজন আধিকারিক। দিগম্বর বাবু সেই প্রৌঢ়াকে জানান আমাকে সুন্দরবনের কিছু ভূমি প্রদান করুন। তখন সেই প্রৌঢ়ার পুত্র দিগম্বর বাবুকে বর্তমান পাথপ্রতিমা ব্লকের দ্বিতীয় ও অষ্টম খন্ড প্রদান করলেন। দুটি খন্ডের মধ্যে দ্বিতীয় খন্ডটি দিগম্বর বাবু নিজের নামে রেখে দিয়ে অষ্টম খন্ডটি বড়দা গোবিন্দ নন্দের হাতে তুলে দিলেন। দিগম্বর বাবুর অধিকৃত খন্ডটির নাম হল দিগম্বরপুর। অপরদিকে বড়দা গোবিন্দ নন্দের অধিকৃত খন্ডটির নাম হল গোবিন্দপুর। পাথরপ্রতিমা ব্লকে গোবিন্দরামপুর নামে আরো একটি গ্রাম রয়েছে। গোবিন্দ নন্দের নামাঙ্কিত গ্রামটি ব্লকের দক্ষিণ অবস্থিত হওয়ায় এর নাম হয়েছে 'দক্ষিণ গোবিন্দরামপুর'।

গোবিন্দ নন্দ নিজ অধিকৃত অঞ্চলে আনুমানিক ১৩০০ বঙ্গাব্দ নাগাদ জঙ্গল হাসিল করার জন্য পৌঁছোলেন। এখানে জঙ্গল পরিষ্কার করার জন্য তিনি তাঁর পুত্র শ্যামাচরণ নন্দকে দায়িত্ব দিলেন। শ্যামাচরণ নন্দ মেদিনীপুর থেকে আদিবাসী মানুষদের এনে অক্লান্ত পরিষ্কার করে ২/৩ বছরের প্রচেষ্টায় আবাদ সৃষ্টি করলেন। তিনি মেদিনীপুর থেকে কৃষকদের এনে জমি প্রদান করে স্থায়ী বসবাসের সুযোগ করে দিলেন। আবাদ সৃষ্টির পর কৃষকরা খাজনা হিসাবে ধান প্রদান করত। সেই খাজনা জলপথে মেদিনীপুর বা কলকাতাতে বিক্রি করার জন্য তিনি নিয়ে যেতেন। পরবর্তীকালে শ্যামাচরণ বাবু তার অধিকৃত অঞ্চল থেকে আদায়িকৃত ধান রাখার জন্য গোলা তৈরীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। কিন্তু সুন্দরবনে গোলা তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় বেত বা বাঁশ পাওয়া যায় না। দিগম্বর বাবুর কাছারীর পূর্ব দিকে পুকুরের পাশে ইঁটের ধ্বংসস্তূপ রয়েছে। তাই তিনি নির্দেশ দিলেন পুকুরের পাশে ইঁটের যে ধ্বংসস্তূপ রয়েছে সেই ইঁট দিয়ে ধানের গোলা বানানো হোক। সময়টা তখন কার্ত্তিক মাসের প্রথমের দিকে। তিনি লোকজন নিয়ে ঝোপ-ঝাড় পরিষ্কার করে সেই ধ্বংসস্তূপ সরাতে দেখতে পেলেন, ইঁটের নীচে বেশ কিছু পাথরের মূর্তি। মূর্তি গুলি দেখতে ছিল অসাধারণ। তখন তিনি সকল ইঁট সরানোর নির্দেশ দিলেন। ক্রমশ মাটি খোঁড়ার ফলে নীচের দিকে একটি গর্ভগৃহ দেখা গেল। বেশ চওড়া দেওয়ালে ঘেরা ছিল গর্ভগৃহটি। এরপর শ্যামাচরণ বাবুর নির্দেশে বাকি লোকেদের উৎসাহে আরো গভীর করে মাটি খনন করা হল। ঘন ঘন কোদালের আঘাত গিয়ে লাগছে মাটির নীচে থাকা অজানা এক পাথরের উপর। শ্যামাচরণ বাবু তখন বললেন কোদাল ছেড়ে শাবল দিয়ে মাটি খুঁড়তে। বেশ কিছুটা অঞ্চল খোঁড়ার পর অবশেষে উঠে এল এক শিবলিঙ্গ। নীচে রয়েছে শক্তিপীঠ। গর্ভগৃহ থেকে একটি নালাও বাইরের দিকে বের হয়ে গেছে। বর্গাকার গর্ভগৃহে শিবলিঙ্গের চারদিকে সাজানো অবস্থায় বসানো ছিল চারটি বিষ্ণুমূর্তি, একটি নটরাজ মূর্তি এবং সাড়ে তিন ফুট উঁচু একটি দশভূজা দুর্গামূর্তি। সবকটি মূর্তি কালো পাথরের। শ্যামাচরণ বাবু মনে মনে ভাবলেন অতীতে কোন এক সময় এই অঞ্চলে মানুষের বসতি ছিল। এই শিবলিঙ্গ এবং পাথরের বিভিন্ন মূর্তি সেই বসতির দেবস্থানের প্রমাণ দেয়। তিনি ভাবলেন প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা কোন এক 'বাৎসিকান'এর আক্রমণে অতীতের এই জন-বসতি ধংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। সেই বসতির স্থাপিত দেবভূমি কত

বছর ধরে মাটির নীচে অনাদরে পড়ে রয়েছে তার কোন হিসাব নেই। ভগবান হয়ত চাইছে শ্যামাচরণ বাবুর হাত ধরে আবার নতুন ভাবে মন্দির নির্মাণ করে দেবতাকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা করা হোক। তিনি নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারলেন না। কোন এক অজানা ভক্তি তার মনের মধ্যে শুধু ঘুরপাক খাচ্ছে। দেবভূমি ভেঙ্গে মাটিতে মিশে গেলেও শিবলিঙ্গসহ পাথরের মূর্তিগুলি অক্ষত রয়ে গেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা মনে করেন শিবমন্দিরের সঙ্গে শক্তিদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক কালিদাস দত্ত, অসীম মুখোপাধ্যায়, নরোত্তম হালদার প্রমুখ গবেষকগণ গোবিন্দরামপুরের ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরটিকে একাদশ-দ্বাদশ শতকের বলে মনে করেন। শিবলিঙ্গটি উদ্ধারের পর শ্যামাচরণ বাবু তাঁর পিতার নামে শিবের নামকণ করেন শ্রীশ্রী গোবিন্দেশ্বরজিউ।

শ্যামাচরণ বাবু মেদিনীপুর থেকে ব্রাহ্মণ এনে দেবাদিদেবের বিগ্রহকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন। তিনি পরিবারের সকলের সঙ্গে আলোচনা করে পুরোহিত রঞ্জন ত্রিপাঠী মহাশয়কে মেদিনীপুর থেকে এনে মন্দিরের পূজক হিসেবে নিযুক্ত করলেন। ১৩২১ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসের শিব-চতুর্দশীতে দক্ষিণ গোবিন্দরামপুরের এই শিবমন্দির পুনঃস্থাপন করা হল। এটি ছিল পাথরপ্রতিমা ব্লকের প্রথম কোন প্রতিষ্ঠিত শিব-মন্দির। শিবলিঙ্গের উপর একটি কুঠি নির্মাণ করে প্রথম বছর স্বাড়ম্বরে শিব-চতুর্দশী পালন করা হল। এই গ্রামে আগত বাসিন্দাদের অধিকাংশ ছিল মেদিনীপুরের বাসিন্দা। তারা সেখানে শিব-চতুর্শীর ব্রত পালন করে এসেছে। আজ এত বছর পর তাদের বর্তমান বাসস্থানে শিব-চতুর্দশীর সূচনা তারা যেন নিজেদের অতীত গ্রামকে ফিরে পেল। আশেপাশের গ্রামে কোথাও কোন শিব-মন্দির ছিল না। শ্যামাচরণ বাবু আগে থেকে জানিয়ে দিলেন শিব-চতুর্দশীর দিনে দক্ষিণ গোবিন্দরামপুর গ্রামে কেউ কোন কাজ করতে পারবে না। নব প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরে সবাই উপস্থিত হয়ে শিব-চতুর্দশীর ব্রত পালন করবে। উপবাস ভঙ্গের পর সবার জন্য ভোজের আয়োজন করা হল। নির্দিষ্ট দিনে আশেপাশের ৮/১০ টি গ্রামের কয়েকশো বাসিন্দা ছেলে-বুড়ো-নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই হাজির হয়ে শিবের ব্রত পালন করলেন। সেদিন মন্দির চত্বর উৎসব মুখর হয়ে উঠেছিল। সেই বছর থেকে বর্তমান দিন পর্যন্ত স্বাড়ম্বরে পূজিত হয়ে আসছে এই দেবাদিদেব মহাদেব। এখানে আড়ম্বরপূর্ণ শিব-চতুর্দশী দেখার জন্য কলকাতার বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনও দেওয়া হল। শ্যামাচরণ বাবুর ডাকে চারণ কবি মুকুন্দ দাস তাঁর দলবল নিয়ে গদামথুরাতে উপস্থিত হয়েছিলেন এক শিব-চতুর্দশীর দিনে। কাকদ্বীপ, নামখানা, ডায়মন্ডহারবার, সাগরসহ, পাথরপ্রতিমার বিভিন্ন স্থান থেকে ব্যাবসায়ীরা এখানে ব্যাবসার পসার নিয়ে হাজির হয় প্রত্যেক বছর। যাত্রা, পুতুল নাচ, তরজা গান, কবিগান অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে প্রথম থেকে। শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ তাঁর ভক্তগণের সঙ্গে নৌকাযোগে গদামথুরাতে উপস্থিত হন। তিনি মন্দির প্রাঙ্গণে বলেছিলেন – 'এটি শিবসাগর, বড় পবিত্র পীঠস্থান'। এখানে গোবধিয়া নদীর একটি খেয়াঘাটের নাম শিবের নামানুসারে 'শিবের ঘাট' হয়েছে। পাথরপ্রতিমা ব্লকের গদামথুরার অষ্টম খন্ড দাক্ষিণ গোবিন্দরামপুর গ্রামের এই শিবমন্দির আজও স্বমহিমায় পূজিত হয়ে আসছে।

তথ্যসূত্র:

ধূর্জটি নস্কর, দক্ষিণ চব্বিশ পরণার শৈবতীর্থ, কলিকাতা, মহেশ লাইব্রেরী, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ

অশোক কুমার পাত্র, প্রতিমা কথা কয়, বারুইপুর, চক্রবর্তী অ্যান্ড পাব্লিকেশন, ১৪২৮

পাথরপ্রতিমা সংবাদ, ১ম বর্ষ, ২২ তম সংখ্যা, ১৬ – ৩০ ফাল্গুণ, ১৪২২

লেখক পরিচিত – পুলক রঞ্জন দাস, এস এ সি টি (শিবানী মন্ডল মহাবিদ্যালয়), আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক

বনবিবি (The Protector of Sundarban)

Author: Soma Bera, Faculty, Department of English, Sibani Mandal Mahavidyalaya

গান গাইতে ভালবাসি, তাই গান গাওয়ার নেশায় ছুটে বেড়িয়েছি বহু জায়গায়। শিখে নেওয়ার চেষ্টা করেছি নতুন নতুন ধারার গান। ছন্দপতনটা তখন হলো যখন ডাক পেলাম একটি অনুষ্ঠানে যার বিষয় ছিল "বনবিবির গান ",যে বিষয়ে আমার এক বিন্দু তথ্য জানা ছিল না। সালটি ছিল ২০০৭। মোবাইল তখন ধারণার বাইরে, আর ইন্টারনেট তো ছেড়েই দিলাম। অগত্যা শরণাপন্ন হলাম আমার এক বান্ধবীর কাছে যার বাড়ি সুন্দরবনের জঙ্গলের একেবারে কাছাকাছি। আমার আবদার শুনে সে বলল, "কাকদ্বীপ এ থাকিস, আর বনবিবি এর নাম শুনিস নি! কাল বাড়ি আয়, বাবাকে বলবো একটা গান শিখিয়ে দিতে "। অগত্যা পরদিন সকাল সকাল পৌঁছে গেলাম তার বাড়ি। শীতলপাটি বিছানায় সবে একটু হেলান দিয়েছি হঠাৎ একটি দৃশ্য আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। দেখলাম সামনের মন্দিরে হিন্দু-মুসলিম দুই ধর্মের মানুষ ই পুজো দিতে আসছেন। বান্ধবী বলল, "অবাক হচ্ছিস নিশ্চয়ই, এই সেই বিখ্যাত বনবিবির মন্দির যার আরাধনা হিন্দু মুসলিম দুই ধর্মের মানুষই করেন।" মনে মনে বললাম এই দুই ভিন্ন ধর্মের মানুষকে এক ছাদের তলায় যে দেবী আনতে পেরেছেন তিনি "বন্য" বা " বনবিবি" হবেন সেটাই স্বাভাবিক। মন জুড়ে যতটা মুগ্ধতা তৈরি হয়েছিল ততটাই ছিল কৌতুহল। কৌতূহল তাকে আরো জানার, আরো চেনার। বান্ধবীর কাছ থেকে পাওয়া একটি বই পড়ে যতটুকু জানলাম তার কিছুটা তুলে ধরলাম :

বাঘের দেবতা দক্ষিণরায় এর হিংস্রতা ও অত্যাচারের সঙ্গে তৎকালীন জঙ্গলে বসবাসকারী মানব সমাজ মানিয়ে নিতে পারেনি কখনোই। তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তখন তারা শরণাপন্ন হন বনবিবির কাছে যিনি ছিলেন গুলাল ও ইব্রাহিম এর কন্যা। বনবিবির পরাক্রমের কাছে পরাজিত হন দক্ষিণ রায়। তারপর থেকেই সুন্দরবনের মানুষজন, বনে কাঠ ও মধু সংগ্রহকারী, জেলে, হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বাঘের বিপদ থেকে বাঁচতে তার পূজা করতে থাকেন। এই বনবিবির মন্দির আমরা আশেপাশের বিভিন্ন জায়গায় দেবী চন্ডী বা ব্যাঘ্র দেবীর মন্দির নামেও দেখে থাকি। কলকাতা থেকে ২০ মাইল দূরে ধবধপি তে ব্যাঘ্র দেবতা দক্ষিণ রায় বা দক্ষিণেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। এছাড়াও কবি কৃষ্ণরাম দাসের "রায়মঙ্গল" কাব্যে দক্ষিণরায়ের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

বুঝলাম নিজের ঠিকানায় সুন্দরবন লিখলেও তার গোড়ায় পৌঁছতে পারিনি এতদিন, মানে একেবারে গোড়ায় গলদ বলতে যা বোঝায় আর কি। বনবিবির একটা প্রতিচ্ছবি মনে মনে আঁকতে থাকলাম, আর হতে থাকলাম আরো মুগ্ধ, আরো কৌতুহলী, আরো বাকরুদ্ধ।

নামখানা গ্রামে মনসা পূজা :
এক ঐতিহ্যবাহী লোকসংস্কৃতি ও সম্মিলিত সামাজিক উৎসব

Author: Prasenjit Mondal, Faculty, Department of Sanskrit, Sibani Mandal Mahavidyalaya

ভূমিকা

গ্রাম বাংলার প্রতিটি উৎসবেই রয়েছে লোকবিশ্বাস, ঐতিহ্য, ভক্তি আর সামাজিক বন্ধনের এক অপূর্ব মেলবন্ধন। তেমনি এক গুরুত্বপূর্ণ লোক উৎসব হল মনসা পূজা। দক্ষিণ ২৪ পরগনা উপকূলবর্তী গ্রাম নামখানায় এই পূজা চৈত্র বৈশাখ মাসে এক বিশেষ ভাবগাম্ভীর্যে পালিত হয়। শুধু ধর্মীয় আচরণ নয়, এই পূজা ঘিরে গোটা গ্রামে সৃষ্টি হয় এক সাংস্কৃতিক মিলনমেলা ও সামাজিক সৌহার্দ্যের পরিবেশ।

মনসা দেবীর মাহাত্ম্য

মনসা দেবী বাংলার প্রাচীন ও জনপ্রিয় লোকদেবী, যাকে বিষহরি নামেও ডাকা হয়। সাপের কামড় থেকে রক্ষা পাওয়া, রোগ ব্যাধি দূর করা ও সংসারের কল্যাণ কামনাই এই পূজার মূল উদ্দেশ্য। গ্রামবাসীরা বিশ্বাস করেন মনসা দেবীকে ভক্তিভরে পূজা করলে জীবনে শান্তি ও সমৃদ্ধি ঘটে। তাই চৈত্র বৈশাখের এই বিশেষ সময়টিতে মনসা পূজা পালন করেন তারা।

পূজার আয়োজন : চাঁদা ও প্রস্তুতি

নামখানা গ্রামের এই মনসা পূজা সম্পূর্ণরূপে একটি সামাজিক উদ্যোগ। গ্রামের প্রত্যেক পরিবার থেকে চাঁদা সংগ্রহ করা হয় এবং সকলে মিলেই আয়োজন করেন। পুজোর, প্রতিমা গঠন, মন্ডপ নির্মাণ ,সাজসজ্জা ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান। এটি গ্রামের একতা এবং সহযোগিতার প্রতীক।

ঘট তোলা : এক মনোরম প্রভাত দৃশ্য

পূজা দিন সকালে সাধারণত সকাল ৪টা থেকে শুরু হয় পূজোর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত ঘট তোলার প্রস্তুতি । সমস্ত গ্রামবাসী একত্রিত হয়ে কাঁসর , শঙ্খ বাজনা বাজিয়ে একসঙ্গে প্রতিমার ঘট তুলতে যান। গ্রামের কোন এক নদীর তীরে বা জলাশয়ে কিংবা পুকুরের ধারে গিয়ে পুরোহিত মহাশয় মন্ত্র পাঠ করে ঘটে করে জল তুলে নিয়ে আসেন । নারীরা উলুধ্বনি দেন, পুরুষরা বাজনা তালে নাচে এবং ছোটরা আনন্দে দৌড়ে বেড়ায়। এই সময় গ্রামের পথে যে দৃশ্য উপস্থাপিত হয়, তা সত্যিই মনোমুগ্ধকর। চারিদিকে ভেসে বেড়ায় ঢাক ঢোল এর শব্দ, ধুপ ও ধুনোর গন্ধ। এই মুহূর্তটি নামখানার জন্য এক আবেগঘন ঐতিহ্য।

পূজা আরম্ভ পর্ব

ঘট তুলে এনে যখন মায়ের মন্ডপে স্থাপন করা হয় তখন থেকে শুরু হয় পুজোর মূল পর্ব। ঘট স্থাপনের পর পুরোহিত মহাশয় শুদ্ধাচারে ধূপ দ্বীপ, ফুল বেল পাতা ফল ও অন্যান্য উপাচার সহযোগী দেবীর পুজো শুরু করেন। পুরোহিত মহাশয় মন্ত্র উচ্চারণ করে দেবীর আহ্বান করেন এবং ভক্তদের উদ্দেশ্যে মন্ত্র পাঠ করে তাদের অংশগ্রহণে পুষ্পাঞ্জলি ও ধুনো

পোড়ানোর আয়োজন করেন। এই মন্ত্র উচ্চারণ ও আরাধনার মধ্য দিয়ে গ্রামের ধর্মীয় পরিবেশ BlJ পবিত্র ও ভাবগম্ভীর হয়ে ওঠে।

পুষ্পাঞ্জলি ও ধুনো পুড়নো পর্ব

বিকেল 2.30 থেকে তিনটের দিকে দেবীর সামনে পুষ্পাঞ্জলি ও ধুনো পুড়নো পর্ব শুরু হয়। ভক্তরা হাতে ফুল নিয়ে দেবীর চরণে অঞ্জলি দেয়। ধুনো পুড়নো সময় ধুনো গন্ধ ধূপের সুগন্ধ এবং ঢাক ঢোলের তালে পূজার পরিবেশ এক বিশেষ আধ্যাত্মিক মূর্তিতে পরিণত হয়। এই সময় গ্রামবাসীরা একাত্ম হয়ে মনসা দেবীর কাছে মঙ্গল কামনা প্রার্থনা করেন।

দণ্ডি কাটা ও মন্দির পরিক্রমা

পুষ্পাঞ্জলি পর্ব শেষ হলে কিছু ভক্ত দন্ডি কেটে দেবীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে মন্দিরের চারপাশে পরিক্রমা করেন। তারা বিশ্বাস করেন যে দণ্ডী কাটার মাধ্যমে তারা মনসা দেবীর আশীর্বাদ লাভ করবেন। অনেকে আবার মায়ের কাছে রাখা মানসিক হিসাবে দন্ডি কাটেন। মন্দিরের চারপাশে দণ্ডিকাটা, উলুধ্বনি এবং জয় জয় মা মনসা গানের শব্দ গ্রামীণ জীবনে এক সুন্দর মেলবন্ধন সৃষ্টি করে।

রাত্রিকালীন সংস্কৃতি অনুষ্ঠান

পূজার সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ হলো রাতভর চলা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নামখানা গ্রামের যুব সমাজ ও গ্রামবাসী বৃন্দ সকলে এই অনুষ্ঠান দেখার জন্য এক জায়গায় সমবেত হয়। মন্দিরের মাঠে বা পাশে কোন জমিতে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা সাংস্কৃতিক দল এই অনুষ্ঠানগুলো পরিবেশন করে থাকেন।

পরিবেশিত অনুষ্ঠান গুলি হল –

মনসামঙ্গল গানের পালা - দেবী মনসার কাহিনী ও চাঁদ সওদাগরের জীবন নিয়ে গাওয়া হয় এই গান।

যাত্রাপালা - লোকনাট্যের মাধ্যমে সমাজ ও ধর্মের নানা বিষয় উপস্থাপিত হয়।

নৃত্য ও আবৃত্তি - শিশু ও কিশোরদের দ্বারা পরিবেশিত হয়ে থাকে নানা রঙিন পরিবেশনা।

বাউল গান ও গাজন - এখানে গানের মাধ্যমে মানুষের আত্মার সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক, প্রেম ও মানবতাদের কথা তুলে ধরা হয়। গাজনে থাকে নকল শিব, ভক্তদের তাণ্ডব নৃত্য এবং ধর্মীয় স্লোগান।

উপসংহার

নামখানা গ্রামের সার্বজনীন মনসা পূজা শুধু একটি ধর্মীয় আচার নয়, এটি একটি লোকজ উৎসব ও সামাজিক ঐক্যের প্রতীক। সকালে পুষ্পাঞ্জলি থেকে শুরু করে রাতে যাত্রা, বাউল গান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সবকিছু মিলিয়ে এটি একটি সার্বজনীন উৎসবে রূপ নেয়। এই পূজা গ্রামীণ সংস্কৃতি ধারক ওবাহক এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তাদের শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত রাখার এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। তাই নামখানার মনসা পূজা শুধু ভক্তি নয়, সমাজ ও সংস্কৃতির মিলনের এক মহান উৎসব।

বিশ্বাসের আলো বুনে...

Author: Rabinraj Tamang, Assistant Professor, Department of Political Science, Sibani Mandal Mahavidyalaya

হ্যালো, শুনছো?
উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করে পড়ে
মুক্ত পরিবেশে উড়ে যাওয়া পাখির মতো
নতুন বিদ্যার্থী,জীবনের মুক্ত আকাশে
একসাথে অনেক রঙিন স্বপ্ন বুনে
উচ্চশিক্ষা আরজনের জন্য
একসময়, যখন আমিও তোমার মতো
গ্রামীণ মহাবিদ্যালয়ের এক বিদ্যার্থী ছিলাম,
প্রবেশদ্বারের সেই সোজা রাস্তাটিতে
হেঁটে চলে যেতাম ধীরে ধীরে,
যেন আমিও আমার প্রিয় বন্ধু
নিজের সঙ্গেই কথা বলতে বলতে—
নি জেকে গড়ে তুলতাম আমি।
আত্মার সেই নিঃশব্দ ডাক,
যা আমি নিজেকেই বলতাম,
শেয়ার করি কিছু? বলি আমার কথা?
প্রতিদিন, কলেজে ঢোকার আগেই
মনে মনে প্রণাম করতাম
মাতা সরস্বতীকে।
শুধু মন নয়, প্রাণ দিয়ে,
নিয়ত করতাম—
শিক্ষাই জীবন,
তাকে দিতে হবে শ্রদ্ধা ও সত্যনিষ্ঠা
সেই শিক্ষালয়েই করতাম আমি সাধনা,
জ্ঞান, যা অমূল্য,
অর্জনের জন্য করতাম
নিজেকে নিঃশর্তভাবে সমর্পণ।
দৃঢ় সংকল্প নিতাম আমি,
প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে।

হ্যালো, শুনছো?
ফেরার পথেও ভেতরে বাজতো সেই প্রতিধ্বনি
আমার সেই সংকল্প,
আমার সেই স্বপ্ন।
নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজেই খুঁজে

নিজেকে সচেতন করতাম।
ভাবতাম, এই কলেজের নাম একদিন
নিশ্চয়ই উজ্জ্বল করবো আমি।
যতই কষ্ট আসুক সামনে,
এই পৃথিবীতে হার মানতে শেখিনি আমি।
প্রতিযোগিতার এই ভরা এই জগতে,
একদিন আমি হবো
নিজ হাতে গড়া এক সম্মানিত সত্তা।
নিঃসন্দেহে নিজেকেই জানাবো সম্মান,
কারণ আত্মার নিঃশব্দ ডাক
প্রতিদিনই স্মরণ করে বারংবার,
দৃঢ় সংকল্পে জ্বলে উঠতাম।

হ্যালো, শুনছো?
গতিশীল সময়ের সাথে সাথে
আগে বড় হচ্ছিলাম।
জীবনযাত্রায় এক যাত্রীর মতোই কিন্তু
জীবনের এই যাত্রা কখনোই সহজ ছিল না।
জীবনের সংজ্ঞা প্রত্যেকের কাছেই
আলাদা হতে পারে, তবুও শেষমেশ
সবার জন্যই এটি এক কঠিন পরীক্ষা।
চূড়ান্তভাবে বুঝেছি জীবন এক সংঘর্ষ
ঘৃণা, প্রেম, সুখ, দুঃখ, হাসি,কান্না
সবাইয়ের সঙ্গেই বন্ধুত্ব করেছি।
সময়ের চড়-থাপ্পড়ও কম খাইনি,
তবু কোনোদিন হার মানিনি।
এবারে বিদ্যার্থী, জীবনের কিছু গল্প মতোই
যে আমি আগে শেয়ার করেছিলাম,
বর্তমানের সংক্ষিপ্ত ব্যবহারিক জীবনের
প্রসঙ্গগুলো শেয়ার করতে চাইছি আমি।

হ্যালো, শুনছো?
আসলে ঈশ্বর, আল্লাহ, ভগবান—
সম্মানীয় অধ্যক্ষ ও সকল প্রিয়
শিক্ষক-শিক্ষিকাদের
আশীর্বাদ ও কৃপা দৃষ্টির সঙ্গে
আমার নিজস্ব পরিশ্রমের ফলেই আজ আমি
মধ্য বর্গীয় পরিবারের, মাতৃভাষাতে
সরকারি বিদ্যালয়ের পড়াশোনা করা

এক অতি সামান্য
বিগত এক সময়ের তোমার মত বিদ্যার্থী
সাফল্যের স্বাদ অনুভব করতে পেরেছি।
তত বড় বলবো না নিঃসন্দেহে হয়েছি সক্ষম
আত্মসম্মান রক্ষা করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে
মহাবিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক হয়ে
অন্তরের গভীর থেকে বলছি—
আমি সত্যিই অত্যন্ত খুশি।
আমরা ছিলাম এক যুগের সন্তান,
আর তোমরা একেবারে নতুন যুগের—
ইন্টারনেট ও ডিজিটালের যুগের প্রতিনিধি।
আমি বিশ্বাস করি,
প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জ্ঞানের দীপ জ্বেলে
তুমি আমার চেয়েও অনেক দূর এগিয়ে যাবে।
তোমার প্রতি আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস—
এবারের সত্যিই আমাকে বচন দাও
তুমি কখনও বিশ্বাসঘাতক হবে না,
আমাকেও তোমার বিশ্বাস ও ভরসা দাও,
তাহলেই নিশ্চিন্তে থাকতে পারবো আমি।
আমার তুলনায় সত্যিই,
তুমি আরও অনেক দূর যাবে...

স্মৃতি

Author: Beauty Khanra, Department of Education, Semester - II, Sibani Mandal Mahavidyalaya

ফিরবে না শৈশব ফিরবে না জানি,

এই কথা ভেবে মোর চোখে আসে পানি

কতই না ছিল স্মৃতি আমাদের মধুর-

ভুলবো না কোনদিন আমি যাই যতদূর।

পিতা ছিল মোর গুরু, মাতা ছিল গৃহিণী ,

দুজনের আদর্শে আজ বড় হয়ে পরিপূর্ণ আমি।

স্কুলটি ছিল মোর জীবনের আদর্শগুরু,

ভুলবো না কোনদিন বড় হয়ে যাই যতদূর।

কতইনা ছিল স্মৃতি আমার বন্ধুদের সাথে,

তারা আজ কত দূরে যে যার পথে।

স্কুল যেতাম মোরা হাহা হি হি করে-

শৈশবের স্মৃতিগুলি আজও খুব মনে পড়ে।

হয়তো যদি আমি একবারও সুযোগ পেতাম,

কিছুই না চেয়ে আমি শৈশবে ফিরে যেতাম।

ঝরে যাওয়া পাতা জানে হারিয়ে যাওয়ার মানে

হয়তো আমিও হারিয়ে যাব শৈশবের স্মৃতি নিয়ে।

প্রকৃতির বেদনা

Author: Pampa Das, Department of Education, Semester - II, Sibani Mandal Mahavidyalaya

প্রকৃতি আমায় বলল সেদিন নয়ন ভরা জলে,

আমার সাথে কি করছ খেলা মৌন থাকি বলে?

ভুলে গিয়েছে অহংকারী মনুষ্যজাতি,

শুধু তারা নয়; মোর সন্তান সহস্র বাঘ, সিংহ, হাতি।

একটি গাছ একটি প্রাণ সবাইতো বলে,

সুযোগ পেলে তারাও ধ্বংস করে ছলে, বলে, কৌশলে।

তৈরী করছ বহুতল আর কাটছ বনভূমি-

উপহারে তাই দিয়েছি তোমাদের বজ্র, ঝড়, সুনামি।

তোমরা তো প্রকৃতির ছায়ায় বেঁচে আছ,

কখনও কি জানতে চেয়েছ?

প্রকৃতি তুমি আমাকে নিয়ে কেমন আছো?

হাসছ, খেলছ, ঘুরছ তোমরা এই প্রকৃতির কোলে,

সেই প্রকৃতিকেই ধ্বংস করছ গাছ কেটে ফেলে।

ফিরেও দেখো না তোমরা গাছ কেটে নিয়ে যাও চলে,

মোদের কিনেই স্বাধীনতা শুধু দাঁড়িয়ে থাকি বলে?

কেন এমন করছ তোমরা বুঝতে কি চাইছ না?

আমি না থাকলে একদিন তোমরাও থাকবে না।।

সমাজ

Author: Piyali Bera, Department of Sanskrit, Semester - II, Sibani Mandal Mahavidyalaya

আজকের সমাজ কেন জানি এমন হল ?

নিজের স্বার্থে পরের ক্ষতি করছে সবাই।

পরে সুখ দেখে জ্বলছে যে তার গা,

মনের মধ্যে গরল রেখে, মিষ্টি কথার পাচন ভরায়।

জ্ঞানীদের করছে অপমান; গুণীদের করছে দোষী,

সত্যি কে বলে "দূরে যা তুই-

মিথ্যা আমার আপন বেশি"।

অজাতেরা জাতের কথা বলে,থাকছে না আর মান-

জ্ঞানীরা বারবার হেরে যায় জ্ঞানহীনদের কাছে।

কেন এমন করছে সবাই?

তোমরা কি কেউ জানো?

সুখে সমাজ করতে হলে,

প্রতিবাদের ভাষা হওয়া চাই জোরালো।।

মা

Author: Sathi Sasmal, Department of Bengali, Semester - IV, Sibani Mandal Mahavidyalaya

মা মানে বন্ধু সম,

মায়ের হাসি মুষ্টিমেয়।

মা মানে শাসন আদর,

মায়ের স্পর্শে জগৎ কাতর।

মা একটি ছোট্ট নাম,

তাতে আছে আমার প্রাণ।

দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধরে,

মা দেখালো আলোর দিশা-

ত্রিভুবন জুড়ে।

মা তুমি আছো বলে আমার পৃথিবীটা-

এত সুন্দর।

ভালোবাসায় জড়িয়ে দিলে,

একটুখানি আদর।

তোমায় ছাড়া ভালো লাগেনা,

মন করে চঞ্চল।

তুমি আমার জীবনের-

একমাত্র সম্বল।

অতি অল্পই উপভোগ

Author: Binita Barik, Department of History, Semester - II, Sibani Mandal Mahavidyalaya

ভ্রমন মানে অচেনাকে চেনা ও অজানা কে জানা। আর মানুষ হলো সুদূরের পিয়াসী। নতুন নতুন জিনিস জানার আগ্রহে মানুষ বার-বার ছুটে যায় দূরে। "কান পেতেছি চোখ মেলেছি, ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি। জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান"। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "বিপুলা এই পৃথিবীর কতটুকু জানি"। তাই এই পৃথিবীর নানা জিনিস সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য অবসর সময়ে আমাদের ভ্রমণ।

লাল মাটির দেশ বিষ্ণুপুর। সেই বিষ্ণুপুরের মায়াময়ী সৌন্দর্য উপভোগ করার উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করলাম বিষ্ণুপুর। সত্যিই কী দুর্দান্ত ঐতিহ্য, ঐশ্বর্যপূর্ণ সেই মন্দির-শহরটি আমাকে সত্যিই মন্ত্রমুগ্ধ করল। ভ্রমণ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আমার সামান্যই, ঠিক যেমন কুয়োর ব্যাঙ। অজানা পৃথিবীকে না-দেখে তার সম্পর্কে যে ধারণা আমার, বিষ্ণুপুর সম্পর্কেও অনুরূপ ধারণা। তার কারণ বোধহয় অন্যান্য ভ্রমণস্থান সম্পর্কে আমার জ্ঞান অতি সামান্য। ভগবানের সহায়ে বেরোলাম সকালে। বকখালীতে যাত্রীর অপেক্ষায় অপেক্ষারত একখানা অতীব রঞ্জিত বাসে চড়ে বসলাম। প্রায় কুড়ি মিনিট বাস চলার পর পৌছালাম নামখানা স্টেশনে। দৃশ্যগত হল কয়েকশ চাকার উপর দাঁড় করানোর এক কেন্নো। মন্দ নয় সে কেন্নো, গতি ও তার মন্দ নয়। কিন্তু ট্রেন যাত্রাটি ছিল একটু অবসাদগ্রস্থ। দীর্ঘ তিন ঘন্টা সেই একঘেয়েমি ট্রেন-চলা। একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম বটে, শিয়ালদহয়ে ডাকি দেখি কেন্নোটিও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। পথ আরো অনেকটা বাকি, এখনো হাওড়া, তারপর বিষ্ণুপুর স্টেশন, তারপর বিষ্ণুপুরের মন্ত্রমুগ্ধকারী দর্শন স্থান। বিষ্ণুপুরের এই ঐতিহাসিক শহর সম্পর্কে যত বলি ততই উপমার অভাব হয়।

মন্দির, শিল্প, ঐতিহ্যব্যাপী কারুশিল্পের সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছে এক মন্ত্রমুগ্ধ কারী মায়াবী পরিবেশ। মল্ল রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত টেরাকোটা মন্দিরগুলি বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি গভীর আস্থার প্রমাণ। রাজা জগৎমল্ল এবং তার বংশধরেরা মন্দিরগুলির প্রধান প্রতিষ্ঠাতা।

সবেমাত্র বছরের শুরু, শীতের মধ্যে বেলা রোদ্রের পশম আর গায়ে রাখতে মন চাইলো না। খুলে ফেললাম পশম। এখানকার শৈল্পিক চেতনা ও ঐতিহ্যবাহী কারুকার্যের প্রমাণ দেয় বিষ্ণুপুরের মহিলাদের পরিহিত বালুচারী শাড়ি, যার সূক্ষ্ম কারুকার্যের এবং জটিল নকশার মধ্যে ফুটে ওঠে বিষ্ণুপুরের প্রকৃতিক, সামাজিক, শৈল্পিক সৌন্দর্য। জগৎ মল্ল ও তার বংশের বীরত্বের প্রতীক দলমাদল কামান, যা নাকি বহু যুদ্ধে তারা ব্যবহার করেছেন। যার দৈর্ঘ্য প্রায় ১২ ফুট ৫ ইঞ্চি।

এখানকার গ্রামীণ হস্তশিল্প, ধতুশিল্প এবং সর্বোপরি লাল মাটি নির্মিত পোড়া মাটির মৃৎ শিল্প নজর কাড়ে। উল্লেখ্য, হস্তশিল্প গুলি হিঙ্গলি পুতুল, সোলার টোপর, কাঠের পুতুল ইত্যাদি। এখানকার দোকানগুলিতে সজ্জিত অমিত নির্মিত কারুকার্য, ঐতিহ্যবাহী দিকগুলিকে উন্মোচন করে। প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাসকে ভালোবাসে এমন ব্যক্তিদের জন্য অবশ্যই একটি দর্শনীয় স্থান আচার্য যোগেশ চন্দ্র পুরাকীর্তি ভবন, বিষ্ণুপুরের স্থানীয় জাদুঘর। এখানে দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর শতাধিক ভাস্কর্য বিদ্যমান। বিভিন্ন প্রকৃতির লোককথা টেক্সটাইলের নমুনা ও প্রাচীন দ্রষ্টব্য, শাড়ি বিদ্যমান।

যতই হোক, ধর্ম সম্পর্কে সমস্ত ব্যক্তি সচেতন। সেই রকম ভাবে হিন্দু ধর্মের প্রতিক মন্দির, মল্লরাজ বীর হাম্বির-নির্মিত রাসমঞ্চ যা রাধাকৃষ্ণের একান্ত মিলন স্থান হিসেবে গণ্য। ল্যাটেরাইট পাথর নির্মিত এই মন্দিরটি ১০৮ টি দরজা ও ৪০ টি স্তম্ভের সমন্বয়ে গঠিত। উত্থিত দেবীর স্বপ্নাদেশে রাজা মল্ল নির্মাণ করেন মৃন্ময়ী মন্দির। আনুমানিক প্রায় ৯৯৭

খ্রিস্টাব্দে তিনি এই মন্দির নির্মাণ করেন। কারুকার্যে শোভিত মদন মোহন মন্দির সত্যিই অপরূপ। রাজা দুর্জন সিং ১৬৯৪ খ্রিস্টাব্দে এই মন্দির নির্মাণের মাধ্যমে তার ঐতিহ্যের কৃতিত্ব রেখে গেছেন। শ্যামরাই মন্দির অসাধারণ ভাস্কর্যে পরিপূর্ণ।

এতকিছুর মাঝে প্রায় কানে ভেসে আসে এক সুমিষ্ট সংগীত। স্থানীয় লোকজনের থেকে জানলাম, এ-সংগীত বিষ্ণুপুর ঘরানার। বছর শেষে এখানকার প্রখ্যাত মেলা 'বিষ্ণুপুর মেলা', সকল প্রকার মানুষের সমাবেশে এই মেলা হয়ে উঠেছে জমজমাট, আবেগপূর্ণ, ভাব বিনিময়কারী মেলা যা প্রকৃতপক্ষে মেলা নয় মিলন উৎসব।

রাজা মল্ল প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুপুর শহরটি সভ্যতা, সংস্কৃতির সংমিশ্রনে নির্মিত শহর। এখানকার মানুষের নৈতিকতা ও মূল্যবোধের প্রতি গভীর মনোযোগ রয়েছে। সামাজিক নিয়মকানুন ও মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা বিশেষভাবে দর্শনীয়। বিষ্ণুপুর মঠের স্থাপত্য ও শিল্প বিষ্ণুপুরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এখানকার লোকনৃত্য ও স্থানীয় সংগীত বিশেষভাবে উপভোগ্য।

মাত্র সাত দিনের ভ্রমণের অবসান ঘটিয়ে বাড়ি ফিরেও শান্তি হল না মন আবার ও চাইছে বিষ্ণুপুর ভ্রমণ করতে। কত কিছুই না দেখার বাকি আছে, কত কিছুই না জানার। হয়তো চিরকালই কুয়োর ব্যাঙ থেকে যাব। কিন্তু চাইলেই এই কুয়ো থেকে বেরোনো যায়, সমস্ত অসাধ্য সাধন করে, সমস্ত বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ানো যায়, কিন্তু অসম্ভব কার্যটি হলো দর্শন পিপাসা মেটানো, যা হয়তো আমার জীবনে চিরকাল অসম্ভবই থেকে গেল।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা

Author: Suranjana Ghorai, Department of Bengali, Semester - VI, Sibani Mandal Mahavidyalaya

বাঙালীদের কাছে বিশেষ করে বাংলা সাহিত্য প্রেমীদের কাছে বিশেষ এক দর্শনীয় স্থান হল জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি। আমার কলেজ শিবানী মন্ডল মহাবিদ্যালয় এখানে বাংলা বিভাগ অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় ড দয়াল চাঁদ সরদার মহাশয় যার উদ্যোগে আমাদের ভ্রমণ সুন্দর এবং আনন্দদায়ক হয়ে উঠেছে। এছাড়াও আমাদের সঙ্গে কলেজেরই শিক্ষাকর্মী সন্দীপ গিরি স্যার মহাশয় যুক্ত ছিলেন। ওনার উপস্থিতি আমাদের ভ্রমণটিকে অন্য মাত্রায় আনন্দিত করেছে। আমরা মোট ১৮ জন ছাত্রছাত্রী মিলে ২৮/১১/২০২৪ তারিখে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে গিয়েছিলাম। আমরা সবাই সকাল সকাল নামখানা থেকে শিয়ালদা গামী ট্রেনে করে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিই। দিনটা খুবই সুন্দর ছিল। আমরা নিউ গড়িয়া স্টেশনে নেমে মেট্রো করে গিরিশ পার্কে যাই। সেখান থেকে সামান্য পায়ে হেঁটে রবীন্দ্র সরণি ধরে আমরা জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে পৌঁছে যাই। তারপর কিছুক্ষণ পর অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে আমরা সবাই জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে টিকিট কেটে ভেতরে প্রবেশ করি। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে প্রবেশের মুখে রাস্তার উপর এ এক বিশাল তোরণ দার দেখতে পাওয়া যায়, যার মাথায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি আবক্ষ প্রস্তর মূর্তি রয়েছে। এটাই জোড়াসাঁকো চেনার প্রধান দিক নির্দেশিকা।

আমার জীবনে প্রথম জোড়াসাঁকো ভ্রমণ আমাকে এক অতুলনীয় সমৃদ্ধি প্রদান করেছে যা আমাকে এক আলাদা শান্তি তৃপ্তি এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে নানা অভিজ্ঞতা প্রদান করেছে। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি মহানগরী কলকাতার অন্যতম উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে একটি। প্রথমে আমি বাড়িটির স্থাপত্য দেখে মুগ্ধ হই বিশাল আকারে এই বাড়িটি পুরনো কালের স্থাপত্য শৈলির একটি নিদর্শন। বাড়িটির ভেতরে বিভিন্ন কক্ষও করিডোর রয়েছে। এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মস্থান ও শৈশবকালের স্মৃতিচিহ্নগুলি আজও বিদ্যমান। প্রতিটি ঘর যেন এক একটি গল্পের বই যা এই পরিবারের ইতিহাস ও ঐতিহ্য উপস্থাপন করে। আমি বিশেষভাবে মুগ্ধ হয়েছি বাড়িটির সংগ্রহশালা দেখে। এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিভিন্ন লেখা ছবি এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত জিনিসপত্র আছে। এই সংগ্রহশালাটি আমাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন ও কাজের একটি স্পষ্ট ধারণা প্রদান করেছে। আমি ওখানে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যবহার করা গাড়ি দেখেছি। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে বোটে করে পদ্মা নদী ভ্রমণ করেছিলেন, সেই বোটের ছোট্ট একটি নিদর্শন জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে দৃষ্টান্ত হিসেবে রাখা আছে যা দেখে আমার চক্ষু সার্থক হয়েছে।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি শুধু একটি বাড়ি নয়। এটি একটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং এটি একটি ঐতিহাসিক স্থান যা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শৈশবের স্মৃতি বিজড়িত জীবনের সাথে সম্পর্কিত। এই বাড়িতে প্রবেশ করে মনে হয় যেন আমি ইতিহাসের পাতায় হেঁটে চলেছি। এই বাড়িতে যেটুকু সময় কাটিয়েছি আমার জীবনে সেটি ছিল সত্যিই একটি আনন্দদায়ক এবং তৃপ্তিদায়ক অভিজ্ঞতা। এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আমাকে আরো বেশি করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতির প্রতি এবং তার পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তুলেছে।

আমি ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই আমার কলেজ শিবানী মন্ডল মহাবিদ্যালয় এর অধ্যক্ষ মহাশয় ড. অতীশ দীপঙ্কর জানাকে, উনি আমাদের জোড়াসাঁকো যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি আমার কাছে একটি সুখাদায়ক আনন্দদায়ক তৃপ্তিকর চক্ষু সার্থক করা একটি শিক্ষামূলক ভ্রমণ কাহিনী হয়ে উঠেছে।

আদর্শ কন্ডাক্টর

Author: Shreya Jana, Department of Sanskrit, Semester - II, Sibani Mandal Mahavidyalaya

বর্তমান সমাজটা অনেক বদলে গেছে। তার সঙ্গে বদলে গেছে মানুষের জীবনযাত্রার প্রণালী। বাস্তব ও কাজের চাপের জাঁতাকলে পড়ে মানুষ কলের পুতুলের ন্যায় আচরণ করছে। ফলস্বরূপ তাদের মধ্যেই অধিকাংশই হয়ে যাচ্ছে খিটখিটে, বদমেজাজ, মানবতাহীন। কিন্তু এসব খিটখিটে, বদমেজাজ, মানবতাহীন মানুষের মাঝখানে কখনো কখনো এমন মানুষও দেখা যায়, যাদেরকে প্রকৃত মানুষের তকমাটা দেওয়া যেতে পারে। এমনি এক মানুষের সাক্ষাতের গল্প বলতে যাচ্ছি।

আমি শশী, পুরো নাম শশীভূষণ রায়। বয়স এখন ২৪ বছর। শহর কলকাতা থেকে প্রায় ১১ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত একটি প্রত্যন্ত গ্রাম সোমনগরে আমার বাড়ি। কাজের সূত্রে এখন কলকাতায় থাকি। বাড়িতে মা, বাবা, দাদা, বৌদি ও তাদের এক সন্তান আছে। ভাইপোর নাম সোহম, ১১ বছর বয়স। শহর দেখার খুব ইচ্ছে, তাই গরমে স্কুলে ছুটিতে আমার কাছে কলকাতায় বেড়াতে এসেছিল। আমিও একদিন কাজের ফাঁক দেখে ওকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে পড়লাম। যাদবপুর এইট বি থেকে কালিকাপুর ভৌমিক মার্বেল আসার জন্য ভাইপোকে নিয়ে একরকম দৌড়ে দৌড়ে এ-সি-নাইনে উঠে পড়ি। সিট পেয়েগেলাম। কিন্তু ততক্ষণে আমার সম্বিত ফিরে পেয়ে পাশের একজনের কাছ থেকে জানতে পারলাম এটি এক বাস। সাধারণত আমি এই পথ টুকুর জন্য এসি বাসে উঠি না। ডেস একটা দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে গিয়ে বাস থেকে নেমে আমার উদ্যোগ নিলে কন্ডাক্টর জানতে চাইলে আমি কোথায় যাব এবং বললেন অন্য বাস স্ট্যান্ডে না থাকায় এই বাসে বসতে। এরপর এক এক করে যা ঘটলো তা আপাত দৃষ্টিতে সাধারণ ঘটনা মনে হলেও আমার কাছে এক অসাধারণ, রোমাঞ্চকর এবং স্মরণীয় ঘটনা হয়ে রয়ে গেল।

কন্ডাক্টর যথারীতি টিকিট কাটা শুরু করলেন। আমাকে অতিক্রম করে এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে আসলেন কিন্তু আমার কাছ থেকে ভাড়া নেওয়ার কোন আগ্রহ দেখালেন না, সেই দেখে আমি বললাম দাদা ভাড়া টা নিন, ভৌমিক মার্বেল দুজনের কত টাকা? বললেন বসুন দেখছি। এই ফাঁকে ভাইপোর নামধাম, কোন শ্রেণীতে পড়ে এমনকি কোন স্কুলে পড়ে তাও জেনে নিল। আমি শুধু অভিভূত হয়ে ভাবছিলাম, এমন মধুর আন্তরিক বাস কন্ডাক্টারও হয়! ইতিমধ্যে বাস অজয় নগর অতিক্রম করে মুকুন্দপুর এসে গেছে। তখন আমি কন্ডাক্টরকে বললাম দাদা, এবার ভাড়াটা নিন। এই কথাটা তিনি শুনলেন নাকি শুনতে চাইলেন না কিছুই বুঝলাম না। এবার আমি মনে মনে ভাবলাম, স্টপেজের গিয়ে ভাড়া দেওয়ার ঝামেলার জন্য আমি আর দায়ী থাকলাম না। বাস সিংহবাড়ি আসতেই যাত্রীদেরকে উদ্দেশ্য করে জানিয়ে দিলেন এবং আমার কাছে এসে বললেন, দাদা ভৌমিক-মার্বেলে নেমে যান। তখন আমি বললাম ভাড়া তো দেওয়া হয়নি। আমার কথার কোন উত্তর না দিয়ে ভাইপোকে বললেন, রবিবার দেখে কাকুকে নিয়ে এইট-বি যাবি, আমি বাসে করে করুণাময়ী থেকে ঘুরিয়ে আনবো। আর আমাকে বললেন আপনি তো ভুল করে আমাদের বাসে উঠেছেন তাই আজকের ভাড়া নেব না। তাও আমি বললাম, না না ঠিক আছে আপনি ভাড়াটা নিন। উনি শুধু বললেন প্রতিদিনই তো নেই, আস্তে আস্তে নামুন, ভাইপোকে নিয়ে রবিবার দেখে একদিন আসবেন। বাস থেকে নেমে আমি এক দৃষ্টিতে বাঁশির দিকে তাকিয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। আমি শতভাগ নিশ্চিত হয়ে বললাম ইনি হলেন আমার জীবনে দেখা শ্রেষ্ঠ বাস কন্ডাক্টর। পরে খোঁজ করে জানতে পারলাম উনার নাম তন্ময়। ঠিক করলাম আবার কোন এক রবিবার দেখে আমার ভাইপোকে নিয়ে বেরিয়ে পড়বো। তবে শুধু AC বাসে ঘুরতে নয়, ওনাকে একটু ছুঁয়ে দেখতে।

বনলতা

Author: Piyali Karan, Department of History, Semester - IV, Sibani Mandal Mahavidyalaya

বড় আকাশের নিচে যখন আমাদের ছোট গ্রামটি দেখতাম মাকে বলতাম মা ওই আকাশে কি আছে মা বলতেন ভগবান থাকেন আকাশে। আমি খুব কৌতহলী হয়ে জিজ্ঞেস করতাম কোন পথ দিয়ে গেলে আকাশে যাওয়া যায় আর ভগবানকে দেখতে পাওয়া যায়। মা মুখে একটু বিরক্তি প্রকাশ করে বলতেন বড় হলে সব জানতে পারবি। আবার যখন মা বলতেন আজ পূর্ণিমা বাড়িতে নিরামিষ রান্না হবে, আমি বলতাম মা পূর্ণিমা কেন হয়? মা বলতেন জানিনা। তোর ঠাম্মাকে জিজ্ঞাসা কর। তখন খুব রাগ হত আমি কি বড় না? আমি তো কত বড় তখন আমার ছয় বা সাত বছর বয়স হবে। আমি তো তখন একা হাঁটতে পারতাম একা খেতেও পারতাম তবে বড় হওয়া কাকে বলে।

প্রথম কন্যা সন্তান হওয়ার অর দ্বিতীয়বার যখন আবার কন্যা সন্তান হয়ে জন্মেছিলাম, বাবার একটু মন খারাপ হয়েছিল তবে তা মাত্র দুই তিন সেকেন্ডের জন্য নিজের ভাগ্য ভেবে তিনি সব মেনে নিয়েছিলেন। । এই কথাটি নিত্যান্তই বাবার মুখে শোনা, যখন দিদির প্রথমবারের পর দ্বিতীয়বার কন্যা সন্তান হয়েছিল দিদি খুব কান্না করছিলেন। তখন বাবাকে জিজ্ঞাসা করছিলাম, আমার জন্মের সময়ও বাবার মন খারাপ ছিল, বাবা মুখে একটি মলিন হাসি দেখে বলেছিলেন - খারাপ কেন লাগবে তুমি আমার ছোট মা। বাবা আমায় ছোট মা বলে ডাকেন সেই ছোট বেলা থেকে। আমার জন্মের সময় পারিবারিকভাবে দেওয়া একটি ভালো নাম থাকলেও স্কুলে ভর্তি হওয়া আগে পর্যন্ত জানতাম না আমার নাম নন্দিনী। ছোটবেলা থেকে সকলে প্রিয় থাকায় খুব দুরন্ত প্রকৃতির ছিলাম বাবা কখনো উঁচুসরে কথা বলেনি। আর মায়ের মেজাজকে গায়ে মারতাম না। তবে বাড়ির গিন্নিমা মানে আমার ঠাম্মা ছিলেন খুব রাগী, কথায় কথায় উনার রাগ বহিঃপ্রকাশ হতো। তবে মানুষ হিসেবে ছিলেন খুব ভালো।

আমার জন্মের সময় আমাদের বাড়ির ছোট্ট বাগানটিতে অবহেলায় অযত্নে বেড়ে উঠেছিল একটি সবেদা গাছ। আমার যখন ছয় বছর বয়স তখন সে আমার থেকে ছয় গুণ লম্বা আকৃতি ধারণ করেছিল। আমার মত তার দুটো হাত দুটো পা ছিল না, তার ছিল একটি পা যা মাটিকে আঁকড়ে ছিল ও দুটি হাত একটিভ হাত উঁচু করে আকাশ ছোঁয়ার চেষ্টায় বেড়ে উঠছিল আর একটি হাত দেহের মাছ বরাবর বিছিয়ে রেখেছিল। হয়তো আমি যাতে ওকে ছুঁতে পারি তাই।

বাগানের ওই সবেদা গাছটি ছিল আমার প্রিয় কারণ গাছটি ছিল আমার সারাদিনের খেলার সঙ্গী তবে আরও একটি কারণেও গাছটি ছিল আমার খুব প্রিয় সেটা হল সবেদা গাছটি আমাদের বাগানে তাই গাছটির সাথে খেলার জন্য আমার খেলার সঙ্গীরা আমায় খুব মান্য করতো। তখন আমি নিজেকে কোন এক সাম্রাজ্যের রানী ভাবতাম, গাছটি আমার সাম্রাজ্য আর প্রজা ছিল আমার খেলার সঙ্গীরা, আমরা সবেদা গাছটিকে নিয়ে গাড়ি গাড়ি খেলতাম, দুজন বসে থাকতো গাছের ডালে আর নিচে থেকে অন্যরা গাছটিকে ঝাঁকা তো, তবে আমি ছিলাম গাড়ির মালিক তাই আমাকে কখনো ডাল থেকে নামতে হয়নি। অন্যরা বদলা বদলি করে উঠতো। আমাদের খেলা নিয়ে আমার বাড়িতে আর প্রতিবেশীদের আমরা চিৎকার করি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এতে তাদের ঘুমে বিঘ্ন ঘটে। তবে যে ওই পাশের বাড়ির কাকিমা ও উনার শাশুড়ির মধ্যে ঝগড়া বাঁধলে প্রতিবেশীরা দুপুর হোক বা সকাল দাঁড়িয়ে লক্ষ করে তখন বুঝি ঘুমের বিঘ্ন ঘটে না?

ঠাম্মা খুব বকতেন তিনি বলতেন যখন হাত না ভেঙ্গে শুয়ে থাকবি তখন বুঝবি পাড়ার ছেলেমেয়ে নিয়ে গাছে চড়ার ফল ।

আমরা এইসব কথায় পাত্তা দিতাম না এগুলি ছিল প্রতিদিনের ঘটনা। তবে আমাদের খেলার সময় একটি কালো মেয়ে প্রতিদিন একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকতো। কেন জানিনা আমি ওকে পছন্দ করতাম না, হয়তো ওর পরনে থাকা ছেঁড়া ময়লা ফ্রকটির জন্য। আমি পছন্দ করতাম না বলে অন্যরা ওর সাথে কথা বলত না।

সেদিন দুপুরে ভাত খাওয়ার পর মায়ের খুব জোরা জোরিতেই দুপুরে ঘুমিয়েছিলাম। মা বলেছিলেন চৈত্র মাসের প্রখর রোদে দুপুরে না খেলে বিকেলে খেলতে। রুমের মধ্যে হঠাৎ জানালার পাশ দিয়ে মৃদু করে তুতুল তুতুল নামটি শুনে

পিটপিট করে চোখ খুলে দেখি না পাশে নেই, আমাকে ঘুমাতে বলে নিজেই হয়তো সংসারে কাজ করছিলেন। জানালার পাশে তাকিয়ে দেখি আমায় বাগানে খেলার সাথীরা, জানালায় একটি হাত রেখে মুখটা উঁচু করে বললাম কি হয়েছে? ওরা বলল তাড়াতাড়ি বাইরে আয়। তোর সবেদা গাছ - এই কথাটি শেষ হওয়ার আগে দৌড়ে গেলাম বাইরে সকলে একসঙ্গে বলতে শুরু করলাম ওই কালো মেয়েটি তোর সবেদা গাছটিকে হাত দিয়ে দেখছে। সেই সময় আমার খুব রাগ অনুমতি ছাড়া আমার প্রিয় কাছে ও কেন হাত দেবে, সামনেই রাখা ছিল খেজুর গাছের ডাল ছোট করে কেটে রাখা হয়তো মা আজ রান্নার জন্য এখানে রেখেছিলেন। সেইখান একটি ছোট ডাল নিয়ে দৌড় দিলাম বাগানের দিকে। বাগানে পৌঁছে দেখি ওই কালো মেয়েটা হয়তো বয়সে আমার থেকে এক বছরের ছোট হবে গাছের ডাল ধরে গাছে ওঠার চেষ্টা করছে অভ্যাস না থাকায় হয়তো উঠতে পারছে না। এই দৃশ্য দেখে আমি ছুটে গিয়ে ওর হাত ধরে বরাবর আমার হাতে থাকা খেজুর লাঠিটি দিয়ে ওকে আঘাত করায় ও জোরে চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করল। এই ঘটনায় আমরা সবাই খুশি হয়েছিলাম। সেই সময় আমি নিজেকে এক বীরপুরুষ ভেবেছিলাম যে শত্রুর হাত থেকে নিজের সাম্রাজ্য রক্ষা করার সার্থক হয়েছিল। ওই কালো মেয়েটার কান্নার আওয়াজ মা সহ অনেকেই তারা কিছু বলেননি। তবে ওর কান্নার আওয়াজ এ বাবা আমায় ডাকেন আমি একজন বীরের মতোই বাবার মত যাই ও অন্যদের বলি ওকেও ধরে নিয়ে আসতে বাবার কাছে তখন ভেবেছিলাম বাবা আমার এই কাজে অনেক খুশি আর ওই কালো মেয়েটাকে শাস্তি দেবেন। কিন্তু তখনও পর্যন্ত আমার হাতে ধরা ছিল সেই খেজুর লাঠিটা।

বাবা আমায় জিজ্ঞেস করলেন ওর কান্নার কারণ আমি সমস্ত ঘটনা বলায় বাবা কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বললেন, তুতুল তুমি গাছটি লাগিয়েছো, সেই দিন বাবা প্রথম বাবা আমায় তুতুল বলে ডেকেছিলেন আমি মাথা নাড়িয়ে না বলায় তিনি বলেন যদি গাছটি তুমি লাগাওনি গাছটা ছোট থেকে বড় হওয়া পর্যন্ত গাছটি যত্নও করনি তবে গাছটি তোমার হলো কিভাবে?

গাছটি নিজে থেকে বড় হয়েছে, তাহলে গাছটির সাথে খেলার অধিকারও সকলের আছে, গাছটি তো ও নিজে থেকে শুধু তোমাকে খেলার অধিকার দেয়নি। বাবার প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারায় আমি বাবার চোখের দিকে না তাকিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তখন বাবা আমায় কাছে টেনে মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন কখনো এমন কোন কাজ করো না যাতে তোমাকে অন্যের সামনে মাথা নিচু করে থাকতে হয় কেন জানিনা আমার চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে গেছিল আর আশেপাশের সবকিছুই ছোট ছোট বিন্দুর মত দেখাচ্ছিল। সেদিন অনুভব করেছিলাম শরীরে আঘাত করলেই শুধু ব্যথা অনুভব হয় তা নয় কিন্তু কথা থাকে যা মনের ভেতরেও ব্যথার সৃষ্টি করে

সেইদিনের ঘটনার পর থেকেই ওই কালো মেয়েটি আর আমাদের বাগানে আসেন। আমি ওদের বাড়িতে যেতে চাইলে বলতেন ওর মা চোর। আমাদের বাগানের নারকেল গাছ থেকে পড়ে যাওয়া একটি নারকেল চুরি করেছিল। একটি নারকেল না বলে নিয়ে গেলে তাকে যদি চোর বলা হয় তবে আমি যে উনার মেয়েকে মেরেছি তাহলে কি আমি খুনি?

ওই কালো মেয়েটিকে দেওয়া আঘাতের কষ্টের সাথে আমার জীবনে যুক্ত হয়েছিল আরেকটি কষ্ট সেটি হল আমার সাত বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই আমার প্রিয় সবেদা গাছটি কেটে দেওয়া হয়েছিল। কেন সেটা হয়েছিল তা জানি না তবে মনে হয় ওর আমার সাথে বড় হওয়ার স্বাধীনতা ছিল না। এত কথার মধ্যে তো বলাই হলো না ওই কালো মেয়েটির একটি মিষ্টি নাম ছিল - বনলতা।

লড়াকু বাবা

Author: Snigdha Maity, Department of History, Semester - IV, Sibani Mandal Mahavidyalaya

আমরা সাধারণত বাবা মানে বুঝি গোটা পৃথিবী। বাবা শব্দটি ছোট হলেও এর অর্থ অনেক বড়, যা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। ভগবানকে আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু তাও আমরা মনের ইচ্ছা পূরণের জন্য প্রার্থনা করি। বাবা তাঁর চেয়ে কিছু কম নন। তিনি কোন স্বার্থ ছাড়া সবার কথা ভেবে ইচ্ছে-পূরণ করতে চান। আমাদের কাছে বাবা মানে ভগবান। কিন্তু বর্তমান সময়ে সেই ভগবান তুল্য বাবা মা কে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসার প্রবণতা বাড়ছে। এতদিন যে বাবা রাত-দিন পরিশ্রম করে ছেলেমেয়েদের বড় করেছেন, তাদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন সেই বাবাকে তারা বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসছে। বর্তমান সমাজের মানুষ বড়ই অদ্ভুত। তবে আমি এখানে শুধু বাবার কথাই বলে যাচ্ছি মাও বাবার থেকে কোন অংশে কম নন। আসলে মা-বাবা দুজনকেই নিয়ে আমাদের গোটা পৃথিবী। একজন না থাকলে যেন মনে হয় পৃথিবীটা পুরো অন্ধকার। এখানে এমনই একজন বাবার কথা বলা হয়েছে। তিনি নানান প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তাঁর পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে পিছ'পা হননি।

একটি গ্রামে রতন নামে একজন ভদ্রলোক বসবাস করতেন। তিনি পেশায় ছিলেন একজন কৃষক। তাছাড়াও দিনমজুরির কাজ করতেন। কিন্তু উনি কৃষক হলেও যথেষ্ট শিক্ষিত ছিলেন। উনি কিভাবে দায়িত্ববান ছেলে থেকে দায়িত্ববান বাবা হয়ে উঠলেন তার একটু গল্প বলি। উনার পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো না থাকায় বেশিদূর পর্যন্ত পড়াশোনা করতে পারেননি। পরিবারে তিনি শুধু একা ছিলেন না তাঁর আরও চারজন ভাই বোন ছিলেন। চার ভাইবোন ও বাবা-মাকে নিয়ে উনি ভালো ছিলেন। কিন্তু সেই সুখ আর বেশিদিন থাকলো না। রতন বাবুর বিয়ের কয়েক দিনের পর উনার মা কঠিন রোগে মারা যান এদিকে রতন বাবুর বাবারও বয়স হয়েছে। তিনি সংসারের দায়িত্ব বড় ছেলে অর্থাৎ রতনবাবুর হাতে তুলে দিলেন। এরপর তিনি বড় দাদা হিসেবে ছোট ছোট ভাই-বোনেদের পড়াশোনা থেকে সবকিছু দায়িত্ব নিলেন। বোনদের বিয়ের বয়স হলে তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করেন। ভাইয়েরাও বিয়ে করে যৌথ পরিবার থেকে আলাদা হয়ে যায়।

এখানে রতন বাবুর ছোট থেকে বড় হওয়ার কথা বললাম রতনবাবু দুটি মেয়ে ও একটি ছেলে ছিল। প্রথমে বাবা-মা, ভাই-বোনেদের দায়িত্ব এরপর এল ছেলেমেয়ে দায়িত্ব। রতনবাবুর স্ত্রী ওনাকে অনেক সাহায্য করতেন। একটা ছোট কুঁড়েঘরে তাদের ছেলেমেয়েকে নিয়ে থাকতেন। তাদের আর্থিক অবস্থা ভালো না থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা করিয়েছেন। ছেলেমেয়েদের সব সময় স্নেহ করতেন। তাদের যাতে পড়ায় আগ্রহ বাড়ে তার জন্য উৎসাহ দিতেন।সারাদিন কাজ করার পর ছেলেমেয়েদেরকে পড়াতেন। ছেলেমেয়েরাও ওনাকে অনেক শ্রদ্ধা করতেন। তিনি তাঁর বড় মেয়েকে কলেজ পাস করিয়ে ভালো ছেলে দেখে বিয়ে দেন। ছোট মেয়ে এখন প্রেম করছে। আর ছেলেটি সবেমাত্র কলেজে উঠেছে। তিনি কিন্তু একবারও বলেনি যে, ছেলে মেয়েদের পড়াবেন না। তিনি শুধু এটাই বলে গেছেন, – "আমি যতদিন বেঁচে আছি তোদের কোন কিছু অভাব রাখবো না।" তিনি ছেলে-মেয়েকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

আমাদের মনে একটা ধারণা থাকে যে যাদের প্রচুর টাকা পয়সা আছে তাদের বাড়িতে ছেলেমেয়েরা বেশিদূর পর্যন্ত পড়তে পারে। কিন্তু আসলে তা যে সত্যি নয় রতন বাবু তার পরিচয় দিয়েছেন। নানান প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও ভাই-বোন থেকে ছেলেমেয়ে সকলের কথা ভেবে গেছে। তাঁর ছোট মেয়ে বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষা দিতে থাকে।ছেলেটিও চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। একদিন রতনবাবু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বিভিন্ন ডাক্তারের কাছে ওনাকে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর জানা গেল তাঁর ক্যান্সার হয়েছে। তাঁর স্ত্রীর হার্টের সমস্যা থাকায় ছেলেমেয়েরা ওনাকে কিছু বলেনি। কিন্তু তাঁর ছেলে এবং মেয়েরা এটা শুনে কান্নায় ভেঙে পড়ে। তারা এটা ভাবতে থাকে যে মানুষটি সারা জীবন নিজের কথা না ভেবে শুধু তাদের

কথা ভেবে গেছে সেই মানুষটিকে সুস্থ করবে কিভাবে। এদিকে ডাক্তারও বলে দিয়েছে, উনি ক্যান্সারের একদম লাস্ট স্টেজে চলে গেছেন আর বেশীদিন বাঁচবেন না।

রতনবাবু অবশেষে তাঁর এই রকম একটা কঠিন রোগের কথা ওনার স্ত্রী কে জানিয়ে বলেন– "আমি আর বেশি দিন বাঁচবো না এটা আমি জানি তুমি ছেলে মেয়েকে নিয়ে ভালো থাকবে।" এই বলে তিনি কাঁদতে থাকেন একদিন মধ্যরাতে তিনি মারা যান। পরিবারের যেমন একজন না থাকলে পুরো পৃথিবী অন্ধকার লাগে রতনবাবুর পরিবারে সেই অবস্থা হয়েছিল। তারপর অনেকদিন কেটে যায়। ওনার ছেলেমেয়ে চাকরি পায়। ঠিক সুখের সময় রতন বাবু পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। একজন বাবার এই দৈনন্দিন বেঁচে থাকার লড়াই সত্যিই অসাধারণ।

এক মুঠো স্বপ্ন

Author: Anindita Das, Department of Bio-Sciences, Semester - II, Sibani Mandal Mahavidyalaya

ছোট্ট একটি গ্রাম —সবুজে ঘেরা, নদীর পাশে, পাখির কোলাহলে ভরা। সেখানেই ছিল আশার বাড়ি। মাটির কুঁড়ে ঘর আর তার মা বাবাই ছিলো তার অমুল্য সম্পদ। আর সেই ঘরের দরজা জানালা দিয়েই আশা প্রতিদিন শহরের বিশাল ভবন, উঁচু উঁচু ইউনিভার্সিটির স্বপ্ন দেখত। গ্রামের স্কুলে পড়েও সে সবসময় প্রথম হতো, শিক্ষকরা বলত, "আশা শহরে পড়লে অনেক দূর যেতে পারবে।"

আশার স্বপ্ন ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া, গ্র্যাজুয়েট হয়ে মা-বাবার কষ্টের শেষ টানা। কিন্তু স্বপ্ন আর বাস্তবতা যে এক নয়—আশা তা হাড়ে হাড়ে বুঝতে শিখল মাধ্যমিক পাশ করার পর থেকেই।

বাবা একজন কৃষক। মাটির সঙ্গে যুদ্ধ করে দিন চলে, কখনো ফসল ভালো হয়, কখনো হয়না। মা গৃহস্থালির কাজ সামলে অন্যের বাড়িতে কাজ করে সামান্য কিছু রোজগার করেন। এই কটা টাকায় তিন বেলার খাবার জোগাড় করাই কঠিন, সেখানে শহরে পড়ার খরচ তো স্বপ্নই।

আশা কলেজে ভর্তি হলেও টিউশনি, বইকেনা, যাতায়াত—সবকিছুতেই বাধা এসে দাঁড়াল টাকার সংকটে। তার কাঁধে চাপল সংসারের দায়িত্ব। কেঁদে উঠল তার ভেতরের শহরের সেই স্বপ্নপাখি, কিন্তু তবুও সে হার মানেনি।

সে গ্রামের একমাত্র পাঠাগারে বসে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরোনো প্রশ্নপত্র পড়ত, শিক্ষকদের কাছ থেকে গাইডনিত, আর মনের মধ্যে কল্পনায় আঁকত ক্যাম্পাসের পথ। কিন্তু একদিন বাবার হঠাৎ অসুস্থতা পুরো সংসারটাকেই ওলট-পালট করে দিল। তার পড়াশোনার খরচ দিয়ে বাবার ওষুধ কিনতে হলো, কলেজে যাওয়া বন্ধ হলো, বইপত্র বিক্রি হলো। তবুও শেষরক্ষা হয়নি। সেখানেই হারিয়েছে তার অমুল্য সম্পদ আর পরিবারের শক্ত খুঁটি টাকে।

তারপরেই নেমে এলো পরিবারের অপর আর্থিক সংকট। অনেক কষ্টেও শুধুমাত্র মায়ের কটা টাকা আয়ে চলতে থাকে তাদের ছোটো সংসার। আশা একটি চাকরি জোগাড় এর চেষ্টা করে কিন্তু এই শিক্ষা নিয়ে কেইবা দেবে তাকে চাকরি।

তার জীবনের মোড়তো তখন ঘোরে যখন এক সন্ধ্যায় তার মা তার কাছে এসে বলে ' দেখ মা, আমি জানি তোর একটা স্বপ্ন আছে শহরে গিয়ে বড়ো বড়ো জায়গায় পড়াশোনা করে খুব বড়ো হওয়ার , কিন্তু আমার তো সেই সামর্থ্য নেই মা আমি যে ব্যর্থ তোর ওই একমুঠো স্বপ্ন পূরণে'।

আশা তখন তার মাকে সান্তনা দিয়ে বলল তুমি চিন্তা করোনা মা আমি ঠিক একটা কাজ জোগাড় করে নিজে পড়াশোনার চালিও নেব। কিন্তু তার মা বলল দেখো আশা মা গ্রামে সবাই যে আমাকে বলছে মেয়ে অমার বড়ো হয়েছে বিয়ে দেবো কবে তোমার। এবার যে সত্যি এটা নিয়ে ভাবছি আমি। তুমি বলো যদি তোমার বাবার মতো হটাৎ করে আমিও চলে যাই তাহলে কে খেয়াল রাখবে তোমার তুমি যে এই নির্মম পৃথিবীতে একা হয়ে পড়বে তখন তোমার পাশে যে কাউকে খুব করে দরকার পড়বে। তাই আমি একজনকে ঠিক করেছি সে ছোটো চাকরি করে আয়ও ভালো তার সাথেই তুমি শান্তিতে সংসার করতে পারবে এই বলে তিনি চলে যান।

আশা তখন ভাবতে বসে তার মা যে কথাগুলো বললেন তা সম্পূর্ণ সত্য কিন্তু তা মেনে নিলে যে তার একান্ত এক মুঠো স্বপ্ন শেষ হয়ে যাবে যা সে কখনও চায়না। তাই সে আজ একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নিল আর তার মার উদ্দেশে রেখে গেলো তার শেষ চিহ্ন তার লেখা এক টুকরো চিঠির পাতা।

কথোপকথন: গ্রাম ও শহরের কথা

Author: Anindita Das, Department of Bio-Sciences, Semester - II, Sibani Mandal Mahavidyalaya

সময়: এক সন্ধ্যায়, যেখানে সূর্য অস্তগামী। আকাশে হালকা আলো।

স্থান: দূর একদিগন্তে, এক কাল্পনিক জায়গায় গ্রাম ও শহরের দেখা।

শহর:

হায়রে, একটা মুহূর্তের শান্তিও নেই আমার! আজকের মিটিং, আগামীকাল কনফারেন্স, তারপর.....

গ্রাম (হেসে):

তুমি তো থামতেই পারোনা শহর। এসো, একটু বসো। আমার বাতাসটা আজ বড়ো মধুর।

শহর (আশ্চর্য হয়ে):

তুমি এখনো এমনিই আছো? সেই পাখির ডাক, ধানক্ষেত, মাটির রাস্তা, মুক্ত বাতাস ?

গ্রাম:

হ্যাঁ, আর এটাই তো আমার অহংকার। প্রকৃতি এখনো আমায় আপন করে রেখেছে।

শহর:

প্রকৃতি তোমায় আপন করলে ও বিজ্ঞান কিন্তু আমায় আপন করে নিয়েছে। তাই তো আমার কোলাহলের মাঝেই মানুষ খোঁজে স্বপ্ন, চাকরি, বড় হওয়া। আমি গড়ি ভবিষ্যৎ।

গ্রাম:

স্বপ্ন দেখতে তো চোখ লাগে, শহর। কিন্তু চোখের শান্তি কোথায় পাবে? তাদের ও যে মুক্ত বাতাস দরকার তাতো আমিই দিই।

শহর (চুপ থেকে):

তুমি জানো? অনেক রাত আমার আকাশে নক্ষত্রই থাকে না, শুধু বাতির আলো। মাঝে মাঝে আমি ও হাঁপিয়ে যাই।

গ্রাম (নরম কণ্ঠে):

তাই তো ছুটিতে মানুষ ছুটে আসে আমার কাছে। আমি তাদের ছোট বেলা ফিরিয়েদিই। আচ্ছা তুমি তো আগে এত সুন্দর ছিলে! আলোকিত, আধুনিক, প্রাণবন্ত। এখন তোমার আকাশ ও যেন কালো মেঘে ঢাকা।

শহর (দুঃখিত স্বরে):

উন্নয়নের নামে আমরা হয়তো নিজের শ্বাস বন্ধ করে ফেলছি। গাছ কাটছি, নদী দখল করছি, বাতাস বিষিয়ে তুলছি।

গ্রাম:

অথচ আমি এখনো খোলা হাওয়া, পাখির গান, সবুজের ছায়া নিয়ে বেঁচে আছি। কিন্তু আমার বুক থেকেও তোমার জন্য অক্সিজেন চুরি হয়ে যাচ্ছে। ধ্বংস হতে শুরু করেছে আমার প্রাণবন্ত প্রকৃতি।

শহর:

সত্যি বলছো, গ্রাম। আমার জীবন আধুনিক হলেও শান্তি হারিয়ে গেছে। এখন আমি বুঝি, প্রকৃতি ছাড়া উন্নয়ন—একটা মরীচিকার মতো।

গ্রাম:

যদি আমাদের মধ্যে আবার সম্পর্ক গড়ে ওঠে, আমি তোমাকে বিশুদ্ধ বাতাস দিতে পারি। তুমি আমাকে একটু ভালোবাসা দাও, আর আমাকে ধ্বংস কোরো না।

শহর: (আস্তে হাসে):

চল, আমরা একসাথে ভাবি। তুমিও টিকবে, আমিও বাঁচব—এই দূষণের দুনিয়ায় একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস একসাথে নিই। এইভাবেই না হয় আমারা একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠবো।

শেষ মন্তব্য:

এভাবেই গ্রাম ও শহর দুজনেই নিজেদের ভূমিকা বর্তমান যা তাদেরকে একে অপরের পরিপূরক করে তোলে।

বর্ষাকাল

Author: Lipika Sardar, Department of Sanskrit, Semester - II, Sibani Mandal Mahavidyalaya

বাংলা বছরের ছয়টি ঋতুর মধ্যে বর্ষা ঋতু এক গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশেষ ঋতুঃ। আষাঢ় ও শ্রাবণ - এই দুই মাসের মধ্যেই বর্ষা ঋতুর আগমন ঘটে। বর্ষাকাল মানে এক অন্যরকম অনুভূতি চারিদিকে সবুজের সমারহ এবং গাছের পাতায় লেগে থাকা বৃষ্টির ফোঁটা গুলো মুক্তোর মত ঝলমল করে। মেঘলা আকাশের গর্জন ও বিদ্যুতের চমকানি, সাথে ঝুম ঝুম বৃষ্টি এবং কদম ফুলের মিষ্টি গন্ধ সব মিলিয়ে এক অপূর্ব দৃশ্য।

বর্ষাকাল মানেই প্রকৃতিতে নতুন প্রাণের সঞ্চার রুক্ষ মাটি তৃষ্ণার্ত হয়ে অপেক্ষা করে এই বৃষ্টির জন্য। অবশেষে একটা সময় আকাশ ঘন কালো মেঘে ঢেকে যায় চারিদিকে ঠিক তারপরেই ঝড়ো হাওয়া ও বজ্রসহ বৃষ্টিপাত হয়। নদী নালা, খাল বিল জলে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে আর ব্যাঙের ডাক শোনা যায় অবিরাম। সবুজ প্রকৃতি ধুয়ে মুছে সতেজ হয়ে ওঠে এবং সবুজের চাদরে ঢেকে যায় চারপাশ। বর্ষাকালে কৃষকের মাঠে প্রাণ ফিরে আসে ধান সহ নানা ফসল চাষ করা হয়। আবার অতিরিক্ত বৃষ্টি বা বন্যা মানুষের ক্ষতি ও করতে পারে।

বর্ষা প্রকৃতিকে মনোমুগ্ধকর করে তোলে প্রেমিক কবিদের মনে অনুপ্রেরণা জাগায় কাজী নজরুল ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় বর্ষার এক বিশেষ স্থান রয়েছে।

বর্ষাকালে গরমের ক্লান্তি দূর হয়ে মন ভরে ওঠে এক স্নিগ্ধ শান্তিতে। বৃষ্টি ভেজা সন্ধ্যায় গরম চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে প্রিয় বই পড়া আর জানালার বাইরে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি দেখা এ এক দারুন অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি এই সময়টা প্রকৃতির সাথে একাত্ম হওয়া সুবর্ণ সুযোগ।

পরিশেষে বলা যায়, বর্ষা ঋতু একদিকে যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অনন্য উৎস, তেমনি এর সঠিক ব্যবহার কৃষিকাজে অপূর্ব ফল বইয়ে আনে তবে অতিবৃষ্টির কারণে সৃষ্ট সমস্যা থেকে সচেতন থাকা উচিত। ।

অতএব সব মিলিয়ে বর্ষাকাল এক মনোমুগ্ধকর ও গুরুত্বপূর্ণ ঋতু, যা প্রকৃতি ও কৃষি জীবনের সঙ্গে নিবিড় ভাবে জড়িত।

ভালোলাগা-ভালোবাসা

Author: Paban Kar, Department of Education, Semester - IV, Sibani Mandal Mahavidyalaya

ভালোলাগা হলো সাময়িক হালকা ধরনের আকর্ষণ। কোনও বিশেষ গুণ, আচরণ বা বাহ্যিক রূপ দেখে মনের মধ্যে সুখানুভূতি সৃষ্টি হয়। এটি আবেগপ্রবণ হলেও সাধারণত গভীর হয় না। এটি ক্ষণস্থায়ী। কারো চেহারা, পোশাক দেখে বা কথা শুনে ভালো লাগতে পারে। তবে এটি দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

অন্যদিকে, ভালোবাসা হলো গভীর, আন্তরিক ও দীর্ঘস্থায়ী এক অনুভূতি। এটি শুধু বাহ্যিক গুণ-এর উপর নির্ভর করে না বরং একজন ব্যক্তির শক্তি ও মানসিকতার সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। এটি দীর্ঘস্থায়ী। এটি সময়ের সঙ্গে আরো গভীর হয় এবং ত্যাগ, মমতা ও দায়িত্ববোধের মাধ্যমে শক্তিশালী হয়।

দিবা স্বপ্ন

Author: Rima Das, Department of Education, Semester - IV, Sibani Mandal Mahavidyalaya

'দিবা স্বপ্ন' হলো জেগে থাকা অবস্থায় কল্পনা বা স্বপ্ন দেখা, এটি সেই মানসিক অবস্থা যখন একজন ব্যক্তি বাস্তবিকভাবে সজাগ থাকেন, কিন্তু তার মন অন্য কোন কল্পিত জগতে বিচরণ করে। এটি সাধারণত গভীর অবেচেতন মনে ঘটে এবং বিভিন্ন চিন্তা, ইচ্ছা, স্মৃতি বা কল্পনার উপর ভিত্তি করে গঠিত হয়।

মানুষ নিজের অজান্তেই দিবা স্বপ্নে মগ্ন হয়ে যায়। বাস্তবিক জগৎ থেকে মন বিচ্ছিন্ন হয়ে কল্পনার জগতে প্রবেশ করে। অনেক সময় মানুষ তার অপূর্ণ ইচ্ছাগুলোকে পূর্ণ করার জন্য দিবা স্বপ্ন দেখে। এটি কল্পনা শক্তি ও সৃজনশীলতা বাড়াতে সাহায্য করে, এটি মানসিক চাপ কমাতেও স্বস্তি দিতে সাহায্য করে।

'দিবা স্বপ্নে' মনোযোগ হারানো বা বিরক্তি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এছাড়া ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করা। কোন কঠিন পরিস্থিতি থেকে নিজেকে মুক্তি দেওয়া আবার অতিরিক্ত দিবস স্বপ্ন দেখা মানসিক বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে এবং কাজের প্রতি মনোযোগ নষ্ট করতে পারে।

'দিবা স্বপ্ন' দেখা যেমন স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় তেমনি এর ভারসাম্য বজায় রাখা ও গুরুত্বপূর্ণ জীবনের কঠিন সময়ের সাহস যোগায়, আবার কখনো আমাদের ভবিষ্যতের লক্ষ্যের দিশা ও দেখায়।

নারী সৌন্দর্য

Author: Soumitra Jana, Department of Education, Semester - IV, Sibani Mandal Mahavidyalaya

নারীর সৌন্দর্য কেবল তার বাহ্যিক রূপে সীমাবদ্ধ নয়; এটি তার অভ্যন্তরীণ গুণাবলী, ব্যক্তিত্ব ও মানসিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সৌন্দর্যকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথমত, বাহ্যিক সৌন্দর্য–যার মধ্যে পড়ে নারীর শারীরিক গঠন, ত্বকের উজ্জ্বলতা, চুলের সৌন্দর্য ইত্যাদি। তবে কেবল বাহ্যিক রূপের মাধ্যমেই সত্যিকারের সৌন্দর্য প্রকাশ পায় না।

নারীর প্রকৃত সৌন্দর্য তার মনন, মানসিকতা, ব্যবহার, কৃতজ্ঞতা ও চারিত্রিক গুণাবলীতে প্রকাশ পায়। একজন সদয়, নম্র এবং সৎ নারী সর্বদা সৌন্দর্যের প্রকৃত প্রতিচ্ছবি।

এই সৌন্দর্য আত্মবিশ্বাস, আত্মসম্মান ও আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যখন একজন নারী নিজেকে ভালোবাসেন, নিজেকে সম্মান করেন এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিজেকে তুলে ধরেন, তখনই তিনি প্রকৃত অর্থে সুন্দর হয়ে ওঠেন।

এডুকেশন কেন পড়ব

Author: Sampa Das, Department of Education, Semester - IV, Sibani Mandal Mahavidyalaya

এডুকেশন বলতে সাধারণত মানুষের জ্ঞান দক্ষতা মূল্যবোধ এবং আচরণ শেখানোর প্রক্রিয়াকে বোঝায়। এটা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি জীবনের উন্নতি সাধন করে।

এডুকেশন মানে জ্ঞান অর্জন করা, দক্ষতা তৈরি করা, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ শেখা। চিন্তাভাবনা ও সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

এডুকেশন পড়লে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বা কোচিং সেন্টারে শিক্ষক বা লেকচারার অনলাইন টিউটর বা কোর্স ইন্সটাক্টর হওয়া যায়। স্কুল বা কলেজের প্রশাসনিক কর্মকর্তা বা শিক্ষা পরামর্শদাতা হওয়া যায়। স্টুডেন্ট কাউন্সিলর ও কেরিয়ার গাইডেন্স বিশেষজ্ঞ হওয়া যায়। পাঠ্যবই রচনা বা কোর্স কনটেন্ট তৈরি ও ই লার্নিং প্লাটফর্মের জন্য কনটেন্ট রাইটার হওয়া যায়।

এডুকেশন নিয়ে পড়লে স্কুল কলেজ বা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার কোচিং করানো যায়। নিজস্ব কোর্স তৈরি করে অনলাইন বিক্রি করে ওয়েবসাইট বাই ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করানো যায়। নোটস গাইড বা রেফারেন্স বই প্রকাশ, স্টুডেন্ট কাউন্সেলিং ও ক্যারিয়ার গাইডেন্স করা যায়। সেমিনার ওয়ার্কশপ বা ট্রেনিং আয়োজন ক্রানো যায়।

মায়াবী প্রেম

Author: Sangita Singha, Department of Education, Semester - IV, Sibani Mandal Mahavidyalaya

"মায়াবী প্রেম"—এই শব্দযুগলে এক অনির্বচনীয় রহস্য ও আবেগের সংমিশ্রণ রয়েছে। প্রেম নিজেই এক মায়াময় অনুভূতি, কিন্তু যখন তা মায়াবী হয়ে ওঠে, তখন তা আরও গভীর, রোমাঞ্চকর ও কল্পনামণ্ডিত হয়ে যায়। এই প্রেমে বাস্তবতা ও কল্পনার সীমারেখা মিশে একাকার হয়ে যায়। এমন এক অভিজ্ঞতা, যা বাস্তব হয়েও মনে হয় যেন স্বপ্নের মতো।

মায়াবী প্রেমে প্রিয়জনের উপস্থিতি প্রতিটি নিঃশ্বাসে অনুভূত হয়। চোখের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে এক রহস্যময় হাসি, যা হৃদয়ে গাঢ় প্রভাব ফেলে।

তবে এই প্রেম সবসময় ধরা দেয় না। কখনো তা অধরাও থেকে যায়। হৃদয়কে ব্যাকুল করে তোলে এই প্রেম, যেন প্রেমিক বা প্রেমিকা মায়ার রাজ্যের বাসিন্দা। তাদের আচরণে থাকে এক অপার্থিব মাধুর্য। মায়াবী প্রেম বাস্তবতাকে ছাড়িয়ে যায়, বিচরণ করে কল্পনার আকাশে। এমনকি স্বপ্নেও তার উপস্থিতি অনুভূত হয়। এ যেন আবেগের অতল জলে ডুবে যাওয়া।

এই প্রেম মানুষের মনে সৃজনশীলতা জাগিয়ে তোলে। প্রেমিক-প্রেমিকা প্রকৃতির কাছাকাছি চলে আসে। মায়াবী প্রেমে ডুবে গেলে, প্রেমিক বা প্রেমিকা নিজেদের সমস্তটা উজাড় করে দেয় ভালোবাসার মানুষটির জন্য।

তবে এই প্রেমে অতিরিক্ত স্বপ্নময়তা কখনো বাস্তব থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। প্রত্যাশা ও বাস্তবতার মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। ফলে হৃদয়ে এক ধরনের অপূর্ণতার বোধ জন্ম নিতে পারে।

বাংলা সাহিত্য ও কবিতায় মায়াবী প্রেমের বহু নিদর্শন রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনানন্দ দাশ এবং কাজী নজরুল ইসলামের রচনায় মায়াবী প্রেমের অপূর্ব চিত্রায়ণ ঘটেছে। গ্রামবাংলার বহু রোমান্টিক কবিতায়ও এই প্রেমের কথা ধ্বনিত হয়েছে।

মায়াবী প্রেম এক স্বপ্নময়, রোমাঞ্চকর ও আবেগঘন অনুভূতি–যা হৃদয়ের গভীরে গেঁথে থাকে এবং আমাদের অন্তরকে আলোড়িত করে।

নারী কি সমাজের বোঝা

Author: Shilpa Ghorai, Department of Education, Semester - IV, Sibani Mandal Mahavidyalaya

আমাদের সমাজে দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত কিছু ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কারের কারণে নারীদেরকে সমাজে বোঝা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। তবে আধুনিক সমাজে এই ধারণাটি ক্রমেই পাল্টে যাচ্ছে। এখন নারীরা সমাজের বিভিন্ন কর্ম ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিভা ও ক্ষমতার স্বাক্ষর রাখছে।

অতীতে নারীদের শিক্ষার সুযোগ সীমিত ছিল ফলে তারা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারত না। তাই অনেকেই তাদেরকে পরিবারের উপর নির্ভরশীল মনে করত।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীদেরকে শুধুমাত্র গৃহস্থলী কাজের জন্য উপযুক্ত মনে করা হতো। তাদের বাইরে কাজ করতে দেওয়া হতো না ফলে তাদেরকে আর্থিক বোঝা মনে করা হতো।

শারীরিক গঠনও সংবেদনশীলতার কারণে অনেকেই মনে করত নারীরা দুর্বল এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষম। অনেক পরিবারে কন্যা সন্তানকে বিয়ের সময় মোটা অংকের যৌথ দিতে বাধ্য করা হয় এই কারণে অনেকেই কন্যা সন্তানকে আর্থিক বোঝা হিসেবে দেখে।

বর্তমান নারী শিক্ষা কর্মসংস্থান ও উদ্যোগ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। নারী এখন ডাক্তার শিক্ষক ইঞ্জিনিয়ার ব্যবসায়ী সহ বিভিন্ন পেশায় সাফল্য অর্জন করেছে। অনেক নারী এখন স্বনির্ভর হয়ে নিজস্ব ব্যবসা পরিচালনা করছে। বর্তমান নারীরা রাজনীতি ও নেতৃত্বেও নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছে। নারীরা সমাজের বোঝা নয় বরং তারা সমাজের সমান অংশীদার সঠিক শিক্ষা সুযোগ ও অনুপ্রেরণার মাধ্যমে নারীরা সমাজের সম্পদে পরিণত হতে পারে। সুতরাং নারীদেরকে বোঝাও ভাবা একেবারেই অযৌক্তিক।

বেকার সমস্যা

Author: Sudipta Mondal, Department of Education, Semester - IV, Sibani Mandal Mahavidyalaya

বেকার সমস্যা বর্তমান সমাজের একটি ভয়াবহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকট হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। ভারতের জনসংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, অথচ সেই তুলনায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত। ফলে দেশের এক বৃহৎ অংশ কর্মহীন অবস্থায় দিন যাপন করছে।

বেকারত্ব এমন একটি সমস্যা, যেখানে একজন ব্যক্তি কাজ করার উপযুক্ত এবং আগ্রহী হলেও তার শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুযায়ী কোনো উপযুক্ত কর্মসংস্থান খুঁজে পাচ্ছেন না। এই পরিস্থিতি শুধু ব্যক্তিগত মানসিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে না, বরং সমাজে অসন্তোষ, অপরাধপ্রবণতা এবং দারিদ্র্যেরও জন্ম দেয়।

বেকার থাকার কারণে একজন মানুষ মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। যখন সে দেখে বহু পড়াশোনা করার পরেও কোনো কাজ পাচ্ছে না, তখন সে হতাশায় নিমজ্জিত হয়। বড় শহরগুলোতে কিছুটা চাকরির সুযোগ থাকলেও গ্রামাঞ্চলে সেই সুযোগ অত্যন্ত সীমিত।

বেকার সমস্যা আমাদের দেশের অন্যতম গুরুতর সমস্যা। এটি শুধু ব্যক্তিগত জীবনে নয়, জাতীয় উন্নয়নেও বিরূপ প্রভাব ফেলে। এই সমস্যা দূরীকরণে সরকার, সমাজ ও ব্যক্তির সম্মিলিত প্রচেষ্টা একান্ত প্রয়োজন। কর্মমুখী শিক্ষা, প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ, আত্মকর্মসংস্থান ও শিল্পায়নের মাধ্যমে বেকার সমস্যার কার্যকর সমাধান সম্ভব।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার

Author: Sipra Das, Department of Sanskrit, Semester - II, Sibani Mandal Mahavidyalaya

ভূমিকা :-

আধুনিক যুগকে বলা হয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রভাব রয়েছে। জীবনযাত্রা সহজ, দ্রুত এবং আরামদায়ক হয়েছে বিজ্ঞানের অবদানেই। প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার আমাদের জীবনে এনে দিয়েছে গতি, সুবিধা, সাফল্য।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সংজ্ঞা :-

বিজ্ঞান হলো পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও প্রযুক্তির মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের একটি পদ্ধতি। আর প্রযুক্তি হল সেই জ্ঞানকে ব্যবহার করে নতুন নতুন যন্ত্র ও পদ্ধতি তৈরি করা যা মানুষের কাজে লাগে। অর্থাৎ বিজ্ঞান জানাই কিভাবে জিনিস কাজে লাগে। আর প্রযুক্তি দেখায় সেটা কিভাবে ব্যবহার করা যায়।

শিক্ষাক্ষেত্রে :-

এখন অনলাইন ক্লাস, স্মার্টবোর্ড, ই-বুক, শিক্ষা অ্যাপ ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সহজ ও আকর্ষণীয় ভাবে পড়াশুনা করতে পারছে

যোগাযোগ :-

মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সবই প্রযুক্তির উপহার। বিশ্ব এখন গ্লোবাল ভিলেজ।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে :-

রোবটিক সার্জারি, ডিজিটাল রোগ নির্ণয়, টেলিমেডিসিন সবকিছুই চিকিৎসাকে করেছে উন্নত ও দ্রুত।

কৃষিতে :-

আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির ব্যবহার কৃষকের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়েছে। সেচ, সার ও বীজের উন্নয়নের বিজ্ঞানের বড় ভূমিকা রয়েছে।

শিল্প ও ব্যবসায় :-

প্রযুক্তির ব্যবহারে উৎপাদন বেড়েছে, সময় ও খরচ কমেছে। ই-কমার্স ব্যবসাকে পৌঁছে দিয়েছে ঘরে ঘরে। ।

বিনোদনে :-

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছোঁয়ায় AI সিনেমা, গান ও ইউটিউব ছবি এক ক্লিকে পাওয়া যাচ্ছে।

বিপদ ও আছে :-

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভুল ব্যবহারে আমাদের জন্য হুমকিও হতে পারে। ইন্টারনেট আসক্তি, গোপনীয়তা হানি, সাইবার অপরাধ, পারমাণবিক অস্ত্র, পরিবেশ দূষণ - এগুলো প্রযুক্তির অপব্যবহারের ফল তাই এর ব্যবহার হতে হবে সচেতন ও মানব কল্যাণ নিবেদিত।

উপসংহার :-

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার আমাদের জীবনে আশীর্বাদ স্বরূপ। এটি আমাদের জীবনকে করেছে গতিশীল, জ্ঞান সমৃদ্ধ ও উন্নয়নমুখী। তাই প্রযুক্তিকে হতে হবে আমাদের সেবক, প্রভু নয়। আমরা যদি সচেতন ভাবে এর ব্যবহার করি, তবে আগামীর পৃথিবী হবে আরো সুন্দর নিরাপদ ও উন্নত।

নারী শিক্ষা

Author: Amita Majhi, Department of Sanskrit, Semester - II, Sibani Mandal Mahavidyalaya

নারী জাতি সমাজের এক অপরিহার্য অংশ, একটি সভ্য সমাজ গঠনে নারী ও পুরুষ উভয়েরই সমান অবদান থাকা প্রয়োজন। কিন্তু বহু যুগ ধরে নারীরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিল। সমাজে কিছু ঘোল ধারণা ও কুসংস্কারের কারণে নারীদের ঘরে আটকে রাখা হতো, আর শিক্ষার সুযোগ শুধু পুরুষদের জন্য সীমিত ছিল। তবে সময়ের পরিবর্তনে মানুষ এখন উপলব্ধি করতে পেরেছে - নারীদের শিক্ষিত করা মানে একটি জাতিকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

নারী শিক্ষা শুধু একজন নারীকেই নয়, তার পরিবার, সমাজ এবং দেশের অগ্রগতিতে ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। একজন শিক্ষিত মা তার সন্তানকে সঠিকভাবে গড়ে তুলতে পারে। নারী শিক্ষার ফলে নারীরা আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠেছে, তারা এখন চাকরি করছে, ব্যবসা করছে, এমনকি নেতৃত্বের আসনেও অধিষ্ঠিত হচ্ছে।

নারী শিক্ষায় একটি দেশের উন্নতির জন্য খুবই জরুরী। আগে সমাজের মনে করা হতো মেয়েদের লেখাপড়া করার দরকার নেই, কিন্তু এখন সবাই বুঝতে পারছে - নারীরা শিক্ষিত হলে পরিবার, সমাজ দেশ উপকৃত হয়। একজন শিক্ষিত নারী ভালো মা, ভালো স্ত্রী ও ভালো নাগরিক হতে পারেন। তারা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। তিনি নিজের সন্তানদের ভালোভাবে গড়ে তুলতে পারেন। চাকরি করতে পারে এবং নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে পারে। আজকাল মেয়েরা ডাক্তার, শিক্ষক, পুলিশ এমন কি বৈজ্ঞানিকও হচ্ছে। কিন্তু এখনো অনেক জায়গায় মেয়েরা ফুলে যেতে পারে না। আমাদের সবার উচিত মেয়েদের লেখাপড়ায় সাহায্য করা ও তাদের পাশে দাঁড়ানো। তবে এখনো কিছু জায়গায় নারী শিক্ষার হার আশানুরূপ নয়। দারিদ্রতা, কুসংস্কার এবং সামাজিক অনগ্রসরতা অনেক ক্ষেত্রেই মেয়েদের স্কুলে যাওয়া বাদ পড়ে দেয়। আমাদের সবার দায়িত্ব নারীদের জন্য নিরাপদ ও সহানুভূতিশীল শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করা এবং তাদের প্রতি উৎসাহ দেওয়া।

একটি দেশের প্রকৃত উন্নতি তখনই সম্ভব যখন দেশের প্রতিটা নারী শিক্ষিত ও সচেতন হবে। নারী শিক্ষা শুধু একটি অধিকার নয়, এটি একটি প্রয়োজন। তাই নারী শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে এগিয়ে আসা উচিত আমাদের সবার। নারী শিক্ষা মানে জাতীর শিক্ষা।

তাই মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করাই আমাদের কর্তব্য।

সংস্কৃত দিবস পালন এর অভিজ্ঞতা

Author: Sathi Senapati, Department of Sanskrit, Semester - IV, Sibani Mandal Mahavidyalaya

দিনটি ছিল ২৩ ফেব্রুয়ারি, আমরা সংস্কৃত ডিপার্টমেন্টের সব বন্ধুরা ও আমাদের প্রসেনজিৎ স্যার ও রিয়া ম্যামের সহায়তায় সংস্কৃত দিবস পালনের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। সবাই মিলে একদম ভোরবেলা বেরিয়ে পড়লাম ব্যাগ গুছিয়ে। সাথে ছিল একটা ডায়েরী, পেন ও জলের বোতল। আমাদের গন্তব্যস্থল ছিল রামকৃষ্ণ মিশন। তার জন্য প্রথমে পৌঁছাতে হল নামখানা স্টেশন, সেখান থেকে লোকাল ট্রেনে চেপে শিয়ালদহ স্টেশন নামতে হল। , আমরা সব বন্ধুরা মিলে খুব মজা করছিলাম এবং সব বন্ধুরা একসাথে থাকায় আমাদের আনন্দের উচ্ছ্বাস ও দ্বিগুণ বাড়তে লাগলো, তারপর আমরা শিয়ালদহ স্টেশন নেমে বাসে করে রামকৃষ্ণ মিশনে পৌছালাম, সেখানে আমাদের প্রথমে নাম জেনে একটা কার্ড দিল এবং টিফিন দিয়েছিল, টিফিনে ছিল একটা পাউরুটি, কলা ও একটা জলের বোতল এবং একটা লাড্ডু। সেখানে আরো অন্যান্য কলেজ থেকে স্যার, ম্যাম এবং অনেক ছাত্র-ছাত্রী এসেছিল। সেই সম্মেলনে বক্তৃতা, গান, আবৃত্তি আরো অনেক কিছু আয়োজন করেছিল। সেখানে ছিল স্বামী বিবেকানন্দের বাড়ি এবং মিউজিয়ামে অনেক কিছু দেখেছি, যেমন - রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক বাড়ি, শোয়ার ঘর, বসার ঘর, আরো অনেক কিছু এখানে থাকতো স্বামী বিবেকানন্দ ও তার পূর্বপুরুষদের এগুলি দেখে আমরা অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। তারপর সেখানে থেকে আমাদের দুপুরে খাবার দিয়েছিল, তারপর খাবার খেয়ে আমরা বাড়ির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের এই সংস্কৃত দিবসের পালনের অভিজ্ঞতা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই স্মৃতি সারা জীবন বয়ে যাবে এখানেই ভ্রমণের সার্থকতা।

In search of pleasure in the Material World

Author: Dr. Kavita Sarkar, Faculty, Department of Education, Sibani Mandal Mahavidyalaya

The tragic crash on the afternoon of June 12, 2025 of an Air India Boeing 787 Dreamliner from Ahmedabad to London Gatwick, shortly after take off from Sardar Vallabhbhai Patei international airport, once again allows us to ponder over the truth of life.

How transient life is. Death is an inevitable truth. In the words of Swami Vivekananda about the final moment of exit, "The world vanishes in a moment and is gone. Standing on the brink of a precipice beyond which is the infinite yawning chasm, every mind however hardened, is bound to recoil and ask 'Is this real?' The hopes of a lifetime, built up little by little with all energies of a great mind, vanish in a second. Are they real?"

In the Mahabharat, the Yaksh asked Yudhishthir, "What is the most wondrous thing in the world?" Yudhisthir replied, "We see countless dying, but it does not occur to us that we will also die one day". The death is stalking us like a shadow which we fail to realise. Being unduly attached to our loved ones and the beauty of the artificial world we have no time to reflect on the transience of life.

Swami Vivekananda says, "The great dream is love; we are all going to love and be loved. We are all going to be happy and never meet with misery, but the more we go towards happiness, the more it goes away from us. We are so enamoured by the good life, fulfilling our aspirations that the higher thinking eludes us". And the higher thinking is that we are not material body but spirit soul. The soul never takes birth and so does not die. But because the soul takes on a material body, the body takes its birth. Anything which has birth also has death is a universal law.

The soul does not at any time become old, as the body does. The so-called old man therefore feels himself to be in the same spirit as in his childhood or youth. As sunlight maintains the entire universe so the light of the soul maintains this material body. As soon as the spirit soul is out of this material body the body begins to decompose.

In the conditioned soul the desire to enjoy the fruitive results of work is so deep rooted that it is very difficult even for the great sages to control such desires, despite great endeavours. As such, the body keeps moving through the cycle of birth and death thinking of enjoyment through sense gratification. But the ignorant man searches for pleasure in the wrong place. The truth is that supreme lord is the master of material nature. He is the beneficiary of all human activities and a source of all pleasures. So the senses should be engaged in the service of the lord if real happiness in this world is to be obtained. In the Srimad Bhagvatam 5.5.1, it is said:

Tapo divyam putrakayena sattvam

Suddhyed yasmad brahma-saukhyam tv anantam

One should undergo penances in life by which existence is purified and by which one can enjoy unlimited transcendental bliss.

Everyone on this planet, according to his quality and position has a particular type of work to perform. One must discharge his prescribed duties for the satisfaction of the lord and without any claim for proprietorship. One has to realise that nothing in the world belongs to any individual person but everything belongs to the supreme lord. This consciousness will help one to evolve spiritually and realise the divine, which is the source of all pleasure.

বেঁচে থাক তপোবন

Author: Ria Chatterjee, Faculty, Department of Sanskrit, Sibani Mandal Mahavidyalaya

মুষ্টিমেয় নীবারধান্যের কণা,
ঝরাপাতার বিস্তীর্ণ পটভূমিতে

মৃগের নিঃশব্দ ঠিকানা।

প্রকৃতির অগোছালো সৃষ্টি

বেঁচে থাক তপোবন।।

সরোবরের গোলাপী শালুক

আর বাঘের চারণভূমি।

হাতির মত্ততায়, সূর্যাস্তের আভায়

বেঁচে থাক তপোবন।।

ছাতিমের হাতছানিতে আর

নীলকণ্ঠের রঙিন স্বরলিপিতে

বেঁচে থাক তপোবন।।

রামধনুর আকাশ ছুঁয়ে,

সন্ধ্যা-আলোর গন্ধ নিয়ে

বেঁচেথাকতপোবন।।

বাল্মীকি, কালিদাস, মাঘের চেতনা

হৃদয়ের অন্তঃস্থলের নিগূঢ় প্রার্থনা

বেঁচে থাক তপোবন।।

রক্তাক্ত কাশ্মীর

Author: Supriya Majhi, Department of Education, Semester - II, Sibani Mandal Mahavidyalaya

সময়টা যখন ২০২৫ ভূস্বর্গ সব শান্ত মুক্তমনা,
হঠাৎ করে পাহেলগাঁওতে এল কিছু উগ্র জঙ্গিসেনা।
গুলির আঘাতে কেড়ে নিল কত হিন্দু প্রাণ-
এখন দেখছি ভূস্বর্গে তাদের যাওয়াটাই হলো কাল।
কাশ্মীর আজ রক্তাক্ত মাটির রং লাল,
অনেকে দিয়েছে প্রাণ কাটিয়ে মায়াজাল।
দোষ কি ছিল ওদের বলতে পারবে কেউ?।
সমাজের বুকে ঠেলে দেওয়া হল ধর্মবিষের ঢেউ।
যারা এই মাটিতে রক্ত ঝরিয়ে হাসে বিজয়ের হাসি,
তাদের কি কোন হবে না শাস্তি কেউ দেবে না ফাঁসি?
আজ উগ্রবাদীরা ভারতের বুকে দেখায় মোদের ভয়,
আমরাও থাকবো না চুপ মানবো না পরাজয়।
যারা ধর্মের নামে ভারত মাতার সন্তান কেড়ে নেবে,
ভারতবাসী ও মানবে না হার উচিত জবাব দেবে।।

ঐতিহ্য

Author: Uma Halder, Department of Education, Semester - II, Sibani Mandal Mahavidyalaya

ইতিহাসের যত কথা থেকে যায় মনে,
যত বেশি ভাবতে থাকি, মোর জল আসে নয়নে।
কতশত রাজা রাজা করেছিল যুদ্ধ,
সেই রাগে শত্রুরা সব হয়েছিল ক্রুদ্ধ।
কেউ বা মরে, কেউ বা বাঁচে, কেউ আহত হয়,
এই কারণে সবার মনে চলতে থাকে ভয়।
কতই না শুনেছিলাম, রাজার রাজত্বকাল,
অতীতের এই কথা শুনে হয়নি নাগাল।
ভাবতে ভাবতে সেই সকল ইতিহাসের কথা,
হর্ষবর্ধন, আকবর, আলেকজান্ডার যথা।
এই ইতিহাস অনেকেরই প্রাণহীন মনে হয়,
কেউ ভাবলে এই ইতিহাস অত্যন্ত মৃন্ময়।
বিজয়গাথা ভারতের এই জীবন্ত ইতিহাস,
যতই পড়ে চলেছি শুধু জগতের পরিহাস।
ইতিহাসের এই কথা হবে নাকো শেষ,
গৌরবের এই ইতিহাস কখনো হয় না যেন নিঃশেষ।।

স্বাধীনদেশ

Author: Kaberi Bera, Department of History, Semester - IV, Sibani Mandal Mahavidyalaya

স্বাধীন আমার দেশ ওগো,

স্বাধীন ভারত ভূমি।

স্বাধীন দেশে বাস করি মোরা,

আমাদের জন্মভূমি।

সেই দেশেতে থাকি মোরা,

সবাই মিলে মিশে।

ইংরেজদের তাড়িয়েছি মোরা,

সবাই একইসাথে।

শহীদের রক্তে রাঙা,

আমাদের ভারত ভূমি।

তাদের আমরা জানাই প্রণাম,

সবাই একই সাথে। ।

তারা

Author: Prasenjit Giri, 3 Year - MDC, Semester - II, Sibani Mandal Mahavidyalaya

আকাশে প্রদীপ্ত কিছু তারা
দেখেছি তাদের ক্ষুদ্র আলোর মতো,
আমার মনটা বড্ড দিশেহারা
ভেবেছি তাদের তুচ্ছ বিন্দু যত।।
আমিতো এখন হয়েছি তরুণ কিশোর
ওরা এখনো তিলের ন্যায় কোনা,
এক ডাকে মোর বসছে মস্ত আসর
অদু ওদের আছেকি আপন জনা।।
কাজের ন্যায় ঘুরছি কত দেশে
চড়ছি কত জাহাজ রেলগাড়ি,
অনাদি ওরা এক জায়গায় বসে
বেকারত্ব, ঠিকানা শুধু বাড়ি।।
আমি মস্ত আমার তুলনা ওরা
যুক্তিটাকি কোনো মতেই সাজে,
বুঝিনি সূর্য নিজেই যে এক তারা
অস্তিত্বহীন আমিই ওদের মাঝে।।

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বিষয়ক একটি প্রবন্ধ

Author: Ananya Karmakar, Department of Political Science, Semester - II, Sibani Mandal Mahavidyalaya

ছেলেটার শিক্ষা হলো না। বারবার আসে বাবার সঙ্গে লড়াই করতে। বারবার পরাস্ত হয় বারবার নাক কাঁটা যায়, কিন্তু ওই যে নাক তো একবারই কাটা যায় আর কাটা নাক নিয়ে বারবার যুদ্ধ করতে অসুবিধা কোথায়! যেমন ধরুন: ভারত আর পাকিস্তান। পাকিস্তান বারবার ভারতের দিকে আঙুল তুলেছে, বারবার আক্রমণ করেছে পরাস্ত করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু যেহেতু ভারত থেকেই পাকিস্তানের জন্ম তাই বাবা হিসেবে ছেলেকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে। বিভিন্ন ধরনের চুক্তি, সন্ধির মাধ্যমে সাহায্য করার চেষ্টা করে চলেছে। ছেলের শিক্ষার জন্য বাবাও বারবার উচিত শিক্ষা দিয়েছে। কিন্তু তাতেও ছেলের শিক্ষা হয়নি। তবে ছেলেকে সঠিক শিক্ষা দেওয়া বাবার ধর্ম। ছেলে আবার সরাসরি বাবার সঙ্গে লড়াই করতে আসে না। সে আবার অন্য লোকের সাহায্য নেয়, যাতে বাবা বুঝতে না পারে যে তার সন্তানই তার পিঠে ছুরিটা গাঁথতে চাইছে। বাবা হয়ে ছেলেকে চিনবে না তা আবার হয় নাকি!

যেমন ধরুন, পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদকে প্রশ্রয় দিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে চালনা করছে। এমন বহু উদাহরণ আমাদের সামনে আছে। ভালো কথা এটাই যে, বিশ্বের কাছে এখন স্পষ্ট: পাকিস্থানই সন্ত্রাসবাদের মদত পুষ্ট। বর্তমানে বিশ্বের যে-কটি যুদ্ধ চলছে, তার তিনটির মধ্যে দুটিই চলছে জঙ্গি সংগঠনের বিরুদ্ধে। তাই বিশ্বের শক্তিশালী দেশগুলি ও ভারতের পাশে আছে। এছাড়াও তারা সামরিক শক্তি দিয়েও সাহায্য করবে। তবে এর মধ্যেও কিছু কিছু দেশ তাদের লাভের জন্যেই ভারতকে সাহায্য করার কথা ভাবছে। যেমন আমেরিকা চায় যে সেখানে তৈরি যুদ্ধবিমান ভারত কেনে, তাই সে চায় ভারত আর পাকিস্তানের যুদ্ধ লাগুক। এছাড়াও রাশিয়া, জাপান, আফগানিস্তান ইত্যাদি দেশও ভারতের পাশে আছে। তাই বলে পাকিস্তানের পাশে কেউ নেই তা নয়, পাকিস্তানের পাশেও বেশ কয়েকটি দেশকে দেখা যাচ্ছে। যেমন চীন, বাংলাদেশ; এছাড়াও তুরস্ক রয়েছে। তুরস্ক পাকিস্তানকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়েও সাহায্য করবে, চীন অর্থ দিয়ে সাহায্য করবে, এমন সময় বাংলাদেশ ভাবছে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হবে, আর তারা পূর্ব ভারতের সেভেন সিস্টার দখল করবে। তবে ভারত যে একসময়ে এদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, তা এদের ভুলতে বিন্দুমাত্র সময় লাগেনি। তুরস্কে ২০২৩-এর ৬ ফেব্রুয়ারি যে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছিল তার উদ্ধারকার্যে ভারতের জাওয়ানরা "অপারেশন দোস্ত"-এর অধীনে অংশগ্রহণ করেছিল। ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেডিকেল টিম এবং ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্সের (NDRF) সদস্যরা তুরস্কের দুর্গম এলাকায় গিয়ে উদ্ধার ও ত্রাণকার্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯৭১ সালে ভারত বাংলাদেশকে পাকিস্তানের অত্যাচার থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ করে বাংলাদেশকে স্বাধীন করে। আর চীন তো বরাবরই ভারতকে শত্রু হিসেবে দেখে এসেছে। এখন এই দেশকে পাকিস্তানের মিত্র হিসেবেই দেখা হয়। তবে ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত চিন-জাপান যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। ১৯৩৮ সালে জাপান যখন চীনের উপর পূর্ণমাত্রায় আক্রমণ শুরু করে তখন ভারত থেকে একটি মেডিকেল টিম গিয়ে চিনের আহত সৈন্যদের চিকিৎসা করেছিল। যাইহোক, সাহায্য ভুলতে বেশি সময় লাগে না।

এবার আসি ভারতের কথায়। ভারতে এর আগে পার্লামেন্টে, মুম্বাইয়ে, উরিহামলা, পুলওয়ামা হামলা এছাড়াও বেশ কিছু জায়গায় হামলা চালিয়েছে পাকিস্থান। কাশ্মীরে তো প্রায় প্রতিদিনই হামলা চালায়। এর প্রতুত্তরে ভারত ও সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, এয়ার স্ট্রাইক চালিয়ে পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদীদের নাস্তানাবুদ করেছে। কিন্তু সন্ত্রাসবাদ শেষ হয়ে যায়নি, কারণ

সেখানের সেনাবাহিনীরা ইলস্কর-ই-ঝাংভি, জৈশ-ই-মহাম্মদ, সিপাহ-ই-সাহাবা পাকিস্তান এই ধরনের জঙ্গি সংগঠন গুলিকে ট্রেনিং দিয়ে থাকে, তাই জঙ্গি সংগঠনগুলো শেষ না হয়ে বেড়েই চলেছে। বর্তমান পরিস্থিতির দিকে দেখলে সদ্য ঘটে-যাওয়া পহেলগাঁও ঘটনাটি। পহেলগাঁও গিয়ে সন্ত্রাসীরা কোনো সেনাবাহিনী বা কোনো স্থাপত্যের উপর আক্রমণ করেনি, সেখানে ভ্রমণরত পুরুষদের শুধুমাত্র কলমা পরতে না পারার কারণে তাদের পরিবারের সামনে হত্যা করা হয়। এবং সেখানে-থাকা একজন গাইডকেও হত্যা করে। মোট ২৭ জনকে সেখানে গুলিবিদ্ধ করে। যারা হত হয়েছেন তাদের মধ্যে একজন ভারতীয় নৌবাহিনীর কর্মকর্তাও ছিলেন। এই হামলার ফলে কাশ্মীরের পর্যটন-ব্যবস্থা একটি কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পরেছে। পর্যটনশিল্প হল কাশ্মীরের প্রধান জীবিকা। তা সাময়িক সময়ের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে। সন্ত্রাসীরা এটাই চায় যাতে ভয়ে পর্যটকরা কাশ্মীরে না আসে আর সেখানের অর্থ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে এবং সেখানের মানুষজনকে ভুল বুঝিয়ে সন্ত্রাসবাদের সাথে যুক্ত করা যায়। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় যথাযথভাবেই এয়ার স্ট্রাইক করেছে ভারত। নাম: অপারেশন সিঁদুর। নামের অর্থ সকলে বুঝতেই পারছেন নিশ্চয়ই।

তবে ভারতের একটি নীতি আছে "No First Strike"। তবে কেউ যদি আক্রমণ করে তবে তাকে ছেড়ে দেবে না ভারত। পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদী হামলা চালিয়ে যাচ্ছে; আর ভারত উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছে, দিচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও দেবে। তবে পাকিস্তান একটু বেশিই চাপে আছে কারণ দেশের মধ্যে গৃহযুদ্ধ চলছে, এক দিকে বেলুচিস্তানের বেলুচ আর্মি পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করে স্বাধীন বেলুচিস্তান চাইছে। সিন্ধু প্রদেশের নাগরিকরা একটি স্বাধীন সিন্ধুরাষ্ট্রের দাবি জানাচ্ছে। এ ছাড়া আরো দুটি রাষ্ট্রের দাবি উঠে আসছে, খাইবার পাখ তুনখোয়া এবং পাঞ্জাব প্রদেশ। তবে এই দুটি রাষ্ট্রের দাবিতে তেমন কোনো আন্দোলন দেখা যায়নি। তবে এই সেই সময়, যখন POK পাকিস্তানের হাত থেকে চলে যাওয়ার অনুমান করা হচ্ছে। কারণ: উন্নত মানের যুদ্ধবিমান, যেমন রাফাল, সুখোই, তেজাস , মিরাজ, মিগ-29 বিমান; এ ছাড়াও একটি শক্তিশালী সীমান্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা—সেন্সর, রাডার, বিভিন্ন ক্ষেপনাস্ত্র , লেজার রশ্মি, ইত্যাদি প্রযুক্তির মাধ্যমে ভারতের স্থলসেনা, বায়ুসেনা এবং নৌসেনা প্রত্যেকেই প্রস্তুত আছে। তাই পাকিস্তান এবারে কোনো রকম সুযোগ পাবে না আত্মরক্ষা করার।

যাই হোক, সন্ত্রাসবাদী হামলায় যে সমস্ত পরিবারের সদস্যরা নিহত হয়েছেন, তাঁদের সমবেদনা জানাই। দাবি জানাই, ভবিষ্যতে যাতে এমন কোনো ঘটনা না ঘটে সেই দিকে সকলেরই নজর তীব্রতর করতে হবে।

যুদ্ধ: একটি অপরাধ

Author: Sk. Sahid, 3-Year MDC, Semester - II, Sibani Mandal Mahavidyalaya

যুদ্ধ হল মানবসৃষ্ট একটি বিধ্বংসী উপাদান, যা সভ্যতার জন্য একটি ব্যাঘাত। এটি মানব সমাজকে নিজের বিধ্বংসী অন্তের দিকে নিয়ে যায়। সকল জিনিসেরই ভালো দিক ও খারাপ দিক রয়েছে কিন্তু যুদ্ধের শুধুমাত্র বিধ্বংসী ক্ষতিকর দিকই আছে। এই গবেষণা পত্রে আমরা যুদ্ধের কারণ ক্ষতিকর বহুমুখী প্রভাব গুলি এবং এটি রোধের উপায় বিশদে বিশ্লেষণ করবো।

ভূমিকা: যুদ্ধ হলো মানব সভ্যতার ইতিহাসের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ধংসাত্মক উপাদান। যেমন পলাশীর যুদ্ধ (23 June 1757) অথবা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (28 July 1914-11 November 1918) যার প্রভাবে বিশ্ব অনেকবারই ভুল রাজনৈতিক এবং আর্থ-সামাজিক ফলাফল ভোগ করেছে। যুদ্ধ মূলত দুই ধরণের, দুটি দেশের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ, যেমন- রাশিয়া এবং ইউক্রেনের যুদ্ধ এবং দুইয়ের বেশি দেশ বা দুটি জোটের মধ্যে যুদ্ধ, যেমন - দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে (1939-1945) মিত্রপক্ষ এবং অক্ষশক্তির মধ্যে সংঘর্ষ। যুদ্ধের প্রভাব শুধু যুদ্ধক্ষেত্র ও সামরিক বাহিনী পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে না বরং এর ক্ষতিকর প্রভাবগুলি সমাজের খুঁটি নাড়িয়ে দেয় যার প্রভাব থেকে সাধারণ মানুষের বাঁচতে পারে না। তাই শুধু নয়, এদের ওপরই সর্বাধিক প্রভাব পড়ে যুদ্ধের। যেমন: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (1939-1945) দেওয়া পারমাণবিক আঘাত থেকে এখনো পর্যন্ত জাপানের হিরোশিমা এবং নাগাসাকি থাকা সাধারন মানুষ ভুলতে পারেনি।

যুদ্ধের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ: যুদ্ধ সাধারণত দুটি প্রধান ধরনের হয়ে থাকে:- 1. আন্তর্জাতিক যুদ্ধ: এটি দুটি বা ততোধিক দেশের মধ্যে সংঘটিত হয়। উদাহরণ প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। 2. গৃহযুদ্ধ: একটি দেশের অভ্যন্তরে দুটি বা ততোধিক গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘটিত হয়। উদাহরণ: আমেরিকার গৃহযুদ্ধ।

কারণ: যুদ্ধে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণে সংঘটিত হতে পারে কারণ আমাদের মানব সমাজ ভালো এবং শান্তির পথ ছেড়ে যুদ্ধের বিধ্বংসী পথ খুব সহজেই বেঁচে নিতে অভ্যস্ত যেমন - (ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধ 1965, 1971)। যে সমস্ত কারণ গুলি উল্লেখযোগ্য তা নিম্নে উল্লেখিত:

A. রাজনৈতিক কারণ: রাজনৈতিক কারণ হলো মূল এবং বিশেষ কারণ যার জন্যই বেশিরভাগ যুদ্ধ গুলি সংঘটিত হয়. 1. ভুমি বা সীমান্ত নিয়ে দ্বন্দ্ব: আমাদের মানব সমাজ বহুবার এই ভূমি বা সীমান্ত নিয়ে যুদ্ধ প্রত্যক্ষদর্শী হয়েছে ও এখনো হচ্ছে. যেমন- ফিলিস্তিনকে নিয়ে আরব এবং ইসরাইলের সংঘাত। 2. রাজনৈতিক মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব: বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন ধরনের মতামতের সংঘর্ষের ফলে আভ্যন্তরীণ যুদ্ধের সূচনা হয় যা পরে বৃহৎ আকার ধারণ করার সম্ভাবনা। যেমন- আমেরিকার গৃহযুদ্ধ। 3. কুটনৈতিক ব্যর্থতা: আলোচনা এবং শান্তিপূর্ণ চুক্তি ভঙ্গ বা আলোচনার ফলে ফলপ্রসূ না হওয়ায় যুদ্ধ সংগঠিত হতে পারে।

B. অর্থনৈতিক কারণ: অর্থনৈতিক কারণে বহুবার যুদ্ধের মুখ দেখেছে আমাদের এই মানব সভ্যতা।1. সম্পদের প্রতিযোগিতা:- এই বিশ্বের মধ্যে সম্পদের যোগান সীমিত কম তাই এইসব সময় এই সম্পদ যেমন তেল জল বা খনিজ সম্পদকে দখল বা হস্তরত করার জন্য যুদ্ধ সংঘটিত হয়. যেমন:-তেলক্ষেত্র নিয়ে ইরাক-কুয়েতের সংঘাত।

2. অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তার: যুদ্ধের মাধ্যমে ক্ষমতা দেখিয়ে অন্য দেশে বাজার সম্প্রসারণ ও নিজের প্রভাব বিস্তারের ঘটনা শুধুমাত্র বর্তমান কালের নয় এটি মানব সভ্যতার শুরু থেকেই চলে আসছে।

C. সামাজিক কারণ: বিভিন্ন সামাজিক কারণেও যুদ্ধ সংঘটিত হতে পারে. 1. জাতিগত ও ধর্মগত উত্তেজনা: আমরা এখনো পুরনো গতানুগতিক চিন্তাধারায় অভ্যস্ত যেখানে আমরা কখনো আমরা সবাই এক, আমরা সবাই একই পৃথিবীর বাসিন্দা সেটা মেনে নিতে পারি না। আমরা এখনো নিজেদের মধ্যে জাত পাত ধর্ম বিচার করে বিবাদ করি, যেমন - রুয়ান্ডার গণহত্যা। 2. জাতীয়তাবাদ: জাতিগত তীব্র গর্ব এবং আধিপত্যের আকাঙ্ক্ষা, যা উভয় বিশ্বযুদ্ধকে ইন্ধন জুগিয়েছিল। 3. জোট এবং চুক্তি: মিত্র দেশের রক্ষা করার বাধ্যবাধকতার জন্য কোন দুই দেশের মধ্যে সংঘটিত ছোট যুদ্ধ বৃহৎ যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়। যেমন- ভারত এবং পাকিস্তানের যুদ্ধ হলে চীন পাকিস্তানকে ও আমেরিকা ভারতকে রক্ষা ও সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দেবে এবং তাদের যুদ্ধকে বৃহৎ আকারে পরিণত হবে।

প্রভাব: যুদ্ধের প্রভাব যুদ্ধক্ষেত্র এবং সৈনিক দলের মধ্যে কখনো সীমাবদ্ধ থাকে না। যুদ্ধ তার ভয়ানক এবং ক্ষতিকর বিধ্বংসী রূপ এবং তার ভয়াবহ বিধ্বংসী দাঁতগুলি দিয়ে আমাদের সমাজ, আমাদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থাকে একেবারে ফালাফালা করে দেয়। শুধু তাই নয় ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য তার মরণ কামড়ের ছাপ রেখে দেয় যেমন - দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকার দেওয়া পারমানবিক আঘাতের ফলস্বরূপ হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে থাকা মানুষ এখনো পর্যন্ত পঙ্গু হয়ে মানসিক অসুস্থতা নিয়ে জন্মাচ্ছে। যুদ্ধের আরো কিছু বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রভাব নিচে উল্লেখ করা হল।

A. সামাজিক প্রভাব: যুদ্ধের সময় আমাদের মানব সমাজের ওপরে যুদ্ধ সর্বাধিক সামাজিক প্রভাব ফেলে। 1. সাধারণ মানুষের মৃত্যু: যুদ্ধের সময় যে শুধুমাত্র সৈন্যদল বা সৈনিকরা এই প্রচুর পরিমাণে মারা যায়, তা নয় এদের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে সাধারণ মানুষও হত্যা হয় যারা জানে না যে তাদের দোষটা আসলে কোথায় কারণ একজন সাধারণ মানুষ কখনো যুদ্ধ চায় না সে শুধু শান্তিতে দুবেলা দুমুঠো খেতে চায়।

Table 1

War	Date	Average deaths per day
Napoleonic	1790-1815	233
Crimean	1854-1856	1075
Balkan	1912-1913	1941
World War I	1914-1918	5449
World War II	1939-1945	7738
(Hiroshima)	August 6th, 1945	80,000

2. শরণার্থী সমস্যা: যুদ্ধের সময় প্রচুর পরিমাণে মানুষকে গৃহহারা হতে হয় বিশেষ করে যুদ্ধক্ষেত্রের পাশাপাশি যাদের বাড়িঘর থাকে তাদের সেগুলি ধ্বংস হয়ে যায় এবং তাদের সেখান থেকে পুরোপুরি ভাবেঅন্য জায়গায় সরে আসতে হয়। এই গৃহহারা মানুষদের দুঃখ আমরা সারা জীবন কখনো বুঝতেও পারব না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে প্রায় ৪০ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ শরণার্থী হয়েছিল। 3. পরিবার বিচ্ছিন্নতা:- যুদ্ধের সময় যেমন প্রচুর পরিমাণে মানুষ গৃহ হারা হয় তেমন প্রচুর পরিমাণে মানুষ পরিবারহারাও হয়। এই যুদ্ধের সময় প্রচুর পরিমাণে সাধারণ

মানুষ তাদের পরিবারের লোকজনদের হারায়। কারো বাবা মারা যায়, কারো দাদা মারা যায়, কারো পুরো পরিবারই ধ্বংস হয়ে যায় এবং এই যুদ্ধের কারণেই তারা অনাথে পরিণত হয়।

B. মানবিক সংকট: এই যুদ্ধকালীন সময় প্রচুর পরিমাণে মানবিক সংকট দেখা যায়-

1. শিক্ষা ও স্বাস্থ্য গত দিক থেকে অবনতি: যুদ্ধকালীন সময় এবং যুদ্ধের পরবর্তী সময় সাধারণ মানুষ যুদ্ধের কারণে সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না এবং শিক্ষাগত দিক থেকে পিছিয়ে পড়ে তেমনি সঠিকভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবা ও পায়না এর ফলে সাধারণ মানুষ খুব সমস্যার সম্মুখীন হয়। 2. মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘন: এই যুদ্ধের কারণে মানুষের যেগুলি সাধারণ মৌলিক অধিকার সেগুলি লঙ্ঘিত হয়।

C. অর্থনৈতিক প্রভাব:- যুদ্ধের কারণে অর্থনীতির উপরেও ব্যাপক প্রভাব পড়ে. 1. অর্থনৈতিক সংকট:- যুদ্ধের ওপরে এত পরিমান অর্থ ব্যয় করা হয় এবং তার ওপরে যুদ্ধের ফলে যে শরণার্থী দেখা যায় তাদের সাহায্য করতে গিয়ে অর্থনৈতিক সংকট দেখা যায়। 2. দারিদ্র্য বৃদ্ধি:- যুদ্ধের কারণে প্রচুর পরিমাণে মানুষ মানুষ তাদের পরিবার এবং গৃহহারা হওয়ার সঙ্গে নিজের কর্মক্ষেত্রেও হারায়। এর ফলে প্রচুর পরিমাণে মানুষ দারিদ্র্য রেখার নিচে নেমে আসে এবং তাদের ভিক্ষে করে জীবন যাপন করতে হয়। যারা দুবেলা দুমুঠো ঠিক করে খেতেও পায় না।

D. পরিবেশগত প্রভাব:- যুদ্ধের কারণে পরিবেশের ওপরেও ব্যাপকক্ষতিকর প্রভাব পড়ে. 1. প্রকৃতি ধ্বংস: প্রকৃতি যা আমাদের বেঁচে থাকার জন্য খুবই প্রয়োজন, যার উপরে নির্ভর করে বহু মানুষ বেঁচে থাকে। যুদ্ধের কারণে তা ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হয়। 2. দূষণ বৃদ্ধি: যুদ্ধের কারণে প্রকৃতিতে দূষণের পরিমাণ অতিরিক্ত বেড়ে যায়. আমরা যুদ্ধের সময় সব কয় প্রকার দূষণ প্রায় দেখতে পাই এবং পারমাণবিক বোমা ব্যবহারের ফলে আমাদের পরিবেশের রেডিয়েশন ছড়িয়ে পড়ে, যা সর্বাধিক ক্ষতিকর। 3. বনাঞ্চল ধ্বংস: যুদ্ধের কারণে যেমন পরিবেশ দূষণ হয় তেমন বনাঞ্চলের প্রচুর পরিমাণে ক্ষতি হয়। এই যুদ্ধের কারণে প্রচুর পরিমাণ বনাঞ্চল এবং গাছপালাও ধ্বংস হয়ে যায় এবং মানুষের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর প্রচুর প্রাণী ও তাদের গৃহহারা হয়।

যুদ্ধ প্রতিরোধের উপায়: আমাদের মানব সমাজ বর্তমানে এমনভাবে বিকশিত হয়েছে যে আমরা খুব সহজেই কোন সমস্যার সমাধান রূপে যুদ্ধ ও হিংসাত্মক পথ খুব সহজেই বেছে নিতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। কিন্তু এটা কখনো ভাবি না যে এতে পরিস্থিতি কতটা খারাপ হতে পারে। কোন সমস্যার সমাধান যে যুদ্ধ ছাড়াও অন্য কিছু হতে পারে তা আমরা কখনোই ভাবি না। শান্তির পথে যে সহজেই সমস্যা সমাধান হতে পারে সেটাও আমরা কখনো ভাবি না।

যুদ্ধের বিকল্প হিসেবে কয়েকটি উপায় হল —-

A. যুদ্ধের ধারণা পরিবর্তন: আমরা যুদ্ধে বলতে শুধুমাত্র অস্ত্রের ব্যবহারই জানি। এই ধারণাটি পরিবর্তন করে নিরস্ত্র যুদ্ধের পদ্ধতি প্রয়োগ। উদ্দেশ্য:- যুদ্ধের গতানুগতিক ধারণা পরিবর্তন, অস্ত্রহীন যুদ্ধ প্রয়োগ, যুদ্ধের ফলে জীবনহানির পরিমাণ কমানো। পদ্ধতি: আমদানি দ্রব্যের ওপরে শুল্কের হার বাড়ানো, বিপক্ষ দেশের তৈরি করা জিনিসের ব্যবহার কমানো। উদাহরণ:- বর্তমানে আমেরিকা ও চীনের tariff war।

B. কূটনৈতিক আলোচনা:- কূটনৈতিক আলোচনা যুদ্ধ প্রতিরোধের অন্যতম প্রধান উপায়। এতে দেশ বা গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে উদ্ভূত সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান খোঁজা হয়। উদ্দেশ্য:- হিংসা এড়িয়ে দুটি

দলের ভেতরে শান্তি প্রতিষ্ঠা। পদ্ধতি: দুই পক্ষ বা আন্তর্জাতিক সংগঠনের মধ্যস্থতায় আলোচনা চালানো। উদাহরণ:- ইরান পারমাণবিক চুক্তি, ইসরায়েল- ফিলিস্তিন শান্তি আলোচনা।

C. শান্তি চুক্তি ও সমঝোতা:- যুদ্ধ বা সংঘর্ষ শেষ করার জন্য শান্তি চুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উদ্দেশ্য: দ্বন্দ্বে এড়ানো এবং পরবর্তী সংঘাত প্রতিরোধ করা। পদ্ধতি: অস্ত্রবিরতি, সীমানা নির্ধারণ, শরণার্থীদের পুনর্বাসন ইত্যাদি। উদাহরণ:- ১৯৭৯ সালে মিশর-ইসরায়েলশান্তি চুক্তি।

D. শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি:- মানবাধিকার, সহনশীলতা ও শান্তির শিক্ষার মাধ্যমে যুদ্ধ ও হিংসা মুক্ত স্বাধীন সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। উদ্দেশ্য: সহিংসতার পরিবর্তে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বোঝাপড়া গড়ে তোলা। পদ্ধতি: স্কুল-কলেজে শান্তি শিক্ষা, মানবিক মূল্যবোধের প্রচার। উদাহরণ:- UNESCO-র শান্তি শিক্ষা প্রোগ্রাম।

E. বহুপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়ন: বহু দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক খুব ভালো হলে যুদ্ধের সম্ভাবনা কমে। উদ্দেশ্য:- আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও শান্তি রক্ষা। পদ্ধতি:- জাতিসংঘ, NATO, SAARC-এর মতো সংগঠনগুলোর ভূমিকা। উদাহরণ:- জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন।

উপসংহার: উক্ত আলোচনায় আমরা যুদ্ধ, যুদ্ধের কারণ, আর তার ফলাফল বিধ্বংসী কথার বিষয়ে অবগত হলাম। যুদ্ধের ফলাফল বারবারই ধ্বংসাত্মক, বিশেষ করে সেটা যদি গোলাবারুদ আর পারমাণবিক অস্ত্র সমূহ দ্বারা সংগঠিত হয়। তাই মানুষ যতই যুদ্ধকে এড়িয়ে চলতে পারবে ততই সেটা মানবতা তথা সমগ্র জীবন জাতির পক্ষে মঙ্গলজনক আর যদি বিশেষ কারণে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয় তাহলে আমরা আলোচনা উক্তিতে বিকল্প যুদ্ধ পদ্ধতিগুলি অবলম্বন করতে পারি।

তথ্যসূত্র:- google, ম্যাগাজিন, বিভিন্ন পত্রপত্রিকা।